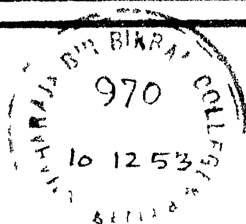
এক বছরের স্বাধীনতা

প্রবোধ ঘোষ

এক বছরের স্বাধীনতা



সিগনেট প্রেস কলিকাতা ২



প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৫৫
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
কলিকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
শিবরাম দাস
মুদ্রক
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওআলিস স্ট্রিট
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
গসেন এণ্ড কোম্পানি
১ শর্ট স্ট্রিট
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম এক টাকা

১ : এ কোন স্বাধীন দেশ

স্বাধীনতার এক বছর : শুধু একটি বছর। কিন্তু তবু লোকে বলে 'উঠন্তি মুলো পত্তনে চেনা যায়।' এ সূর্য-সূচনা কেমন? কী হল একটা বছরে? কী দেখলাম? নয়া দিল্লির বার্তা ও ইঙ্গিত ছড়িয়ে গেল কি ভারতের গ্রাম থেকে গ্রামান্তে? অনেকগুলো বছরের গ্লানি ও অপমান, অনেক দুঃখ আর অপরিমেয় অত্যাচার, বহু দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকারে ভরা ইতিহাসে এল বড়ো কষ্টের এই স্বাধীনতা। হকেনো হাড় আর মড়ার খুলির বোঝা পিছনে রেখে এগিয়ে এল স্বাধীনতার রথচক্র। সামনে এবার অনবসর ভবিষ্যৎ। তারই হিসাব এর বছরের।

প্রথমেই কয়েকটা কথা বলা দরকার। কথাগুলো আর কিছু নয়, শুধু অতীতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ। অতীত মরে না, দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে বর্তমানের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ রচনা করে চলে। এটা কবিত্ব নয়, খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য; ইতিহাসের নৈতিক শক্তি কার্য-কারণের ধারাচয়। যুগে যুগে ভারতের মানচিত্র বদলে চলেছে বহিঃশত্রুর আক্রম আর গৃহবিবাদের সঙ্গে। যে অখণ্ড ভারতের কথা বলতে গিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি সেই ভারত খণ্ডিত হয়েছে অনেক

বার অনেক রকমে। প্রাক্‌-বৈজ্ঞানিক যুগে দূরত্বের দুঃখ আর প্রকৃতির বাধা একেবারে দূর করা সম্ভব হয়নি। তাই নানা কারণে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা ও আচার-বিচার নিয়ে ভারতের জীবন হয়েছে অত্যন্ত জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল। স্বাধীনতার একটা বছরেই এ কথার সত্যতা আমরা দিনে দিনে বুঝেছি। তবু বহু শতাব্দীর জলবায়ু আর বহু পুরাতন মাটি একটি ভারতীয় মন গড়ে তুলেছে সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে। সে-মন জনসাধারণের মন, তাদেরই জীবনভঙ্গী উচ্চ স্তরের জীব যাঁরা তাঁদের দেশপ্রেম অনেকটা স্বার্থের বস্তু, খানিকটা বুদ্ধির, বাকিটা হয়তো দম্ভের। কিন্তু নীরব গণসমাজ মাটিকে ভালোবেসেছে, ভালোবেসেছে দেশের জল, আলো, হাওয়া, দেহে ও মনে ছয়টি ঋতুর অফুরন্ত পটপরিবর্তন। এই মাটির পৃথিবী আজও তাদের কাছে একটি অপরূপ বিস্ময়। দেশের বিপদে তারাই মার খেয়েছে বেশি, বন্যা আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর মহাযুদ্ধে তারাই উড়িয়ে গেছে। মনুষ্যত্বের এই অভিশপ্ত সন্তানেরা ইতিহাসে স্থান পায়নি। এক বছরের স্বাধীনতা কি তাদের পরিচয় দিয়েছে ?

ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার কল্পনা ভারতের ইতিহাসে প্রায় মেলেই না। পরাধীনতার ঐতিহাসিক কারণ ও প্রয়োজন তাই আমাদের ঘটেছিল। নিজের সুবিধার জন্যই বিদেশী বণিক-সম্রাটের ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা। ফল হল বিপরীত, এল জাতীয় চেতনা। একেই বলে ইতিহাসের বিদ্রূপ। উনিশ শতকের শেষভাগে এল নবযুগের সম্ভাবনা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি মহাযুদ্ধের মর্মান্তিক অশান্তি ও অসন্তোষ। এই নবচেতনার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আমাদের এই বড়ো দুঃখের স্বাধীনতা। ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের স্বদেশ ; ইংরেজের স্বদে 'হেথা

নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে।' এখানকার সুখদুঃখের অংশীদার ওরা হয়নি ; ভারতের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক নেই ওদের, ছিল শুধু শোষণের। ওদের আমলে অত্যাচার ও লুণ্ঠন আর ধ্বংসের একটা ঝড় বয়ে গেছে, এমন নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে যে আবার আমরা খণ্ডিত ভারতে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেছি। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ও ভাগ্য নিয়ে নিষ্ঠুর জুয়ার খেলায় স্বার্থান্বেষী কুচক্রীরা করেছে এই দেশ-বিভাগ। ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসৃষ্টি প্রগতির লক্ষণ নয়, মধ্য-যুগের ধর্মোন্মাদ, ইতিহাসের পশ্চাদপসরণ। হয়তো সব অসুখেরই ওষুধ হল সময়, হয়তো ইতিহাসের কাঠগড়ায় ভাবীকালের বিচারে দেশী-বিদেশী অনেক প্রভুই হবেন আসামী। ইংরেজ ভারত দখল করেছিল ছলে বলে কৌশলে। আমাদের স্বাধীনতাও যেন ছলনা না হয়। কিন্তু অতীতের মুক্তি-সৈনিকেরা খণ্ডিত ভারতের মুক্তি চায়নি। তারা মরেছে, আর কোলাহল চালিয়েছে শবসম্ভোগী শকুনের পাল। এক বছরের স্বাধীনতায় ভারত আর পাকিস্তান আরো দূরে সরে গেছে। বিদেশী চক্রান্ত কি সফল হবে ?

নানা কারণে ইংরেজের পক্ষে ভারতকে সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক দখলে রাখা সম্ভব ছিল না : তাই স্বাধীনতা। ভারতকে আর্থিক ও রাজনৈতিক হিসাবে প্রাচ্যশক্তি হতে দেওয়া ইংরেজের স্বার্থবিরোধী : তাই বিভাগ। আর স্বাধীনতার প্রথম বছর কেটেছে এই বিভাগেরই জের টেনে।

কয়েকটা বিষয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ভারতের গেরুয়া রঙের মাটি সকলকেই কেমন যেন বৈরাগী করে রেখেছে ; কোনো কিছুই সহজে আমাদের স্থবির মনকে নাড়া দিয়ে সচল করতে পারে না।

কাশীতে গ্রহণের উৎসবে বিরাট হিন্দু জনতা দেখে হাক্‌স্‌লি লিখেছিলেন যে এতগুলো লোক পারলৌকিক চিন্তা একটু কমিয়ে দেশের দিকে তাকালেই ভারত স্বাধীন হয়ে যেত। মুসলমানদেরও একই অবস্থা, ধর্মের জটিলতায় সামাজিক জীবন হয়েছে পঙ্গু। পরিবর্তন ঘটেনি ধনী-দরিদ্রের শ্রেণীগত স্বার্থবিরোধে। স্বাধীন ভারতে ধর্মঘটের তিরোভাব হয়নি, ধীরে ধীরে দুটি শ্রেণী দূরে সরে চলেছে। হয়তো এই ধনী-দরিদ্রের বিবাদের মধ্যেই আগামী ইতিহাসের বীজ লুকিয়ে আছে। যে স্বাধীনতা সারা দেশের কাম্য হওয়া উচিত ছিল, যে স্বাধীনতায় নবজন্মের সম্ভাবনা ছিল, তার অংশীদার হতে পারেনি জনসাধারণ। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো গেছে কিপ্‌লিঙের 'শ্বেত মানবের দায়', গেছে হয়তো 'পাম্-পাইনের রাজত্ব', কিন্তু কোথায় জনরাজ, কোথায় গণতন্ত্র? 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গাইবে কি প্রেতমূর্তি কঙ্কালের দল? অনেক দিন দাসত্বের পরে স্বাধীনতা মিলেছে। তাই সমস্যার আর অন্ত নেই। অবশ্য দুঃখভোগ না করে মুক্তি অর্জন করা যায় না; কড়ায়-গণ্ডায় ইতিহাস দাম আদায় করে নেয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর? একতার অভাব, সহানুভূতি নেই, সংগঠন নেই, নেই খাঁটি আদর্শবাদ। স্বাধীনতা পাওয়া আর স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়ে বেঁচে থাকা এক কথা নয়। অনেক রকমে আমাদের নৈতিক অবনতি হয়েছে। কিন্তু তবু একথা ঠিক যে আদর্শবাদের মৃত্যু নেই, যদি ঘটে তাহলে মানুষের পৃথিবীও শেষ হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার স্বরূপ কী? শুধু কি বিদেশী জুলুম আর শোষণের হাত থেকে মুক্তি? এ যদি স্বাধীনতা হয় তাহলে তার মূল্য খুব বেশি নয়। যে রাজনৈতিক আদর্শ দাসত্বের দিনে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল

তার সঙ্গে চামড়ার রঙের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। আমাদের স্বাধীনতার দলিলের প্রথম কথাই হচ্ছে এমন এক খাঁটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেখানে শ্রেণীগত পার্থক্য নেই, নেই অত্যাচার ও শোষণের সম্ভাবনা; যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে দেশের সমষ্টিগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রতিজ্ঞা। এক বছরের স্বাধীনতায় কেউ আশা করতে পারে না যে হঠাৎ স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে। কিন্তু পথের শেষে এসে না পৌঁছলেও পথের আরম্ভ তো হবেই? আমরা কি ঠিক পথে চলেছি? বছরের শেষে এই প্রশ্নই আমাদের সকলের মনে এসেছে। সে-প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই আসা উচিত; না এলে স্বাধীনতার কোনো অর্থই হয় না। বছরের পর বছর চক্রের আবর্তনে স্বাধীনতা দিবস ফিরে আসবে। কিন্তু ব্রত পালন ও উদ্‌যাপন হবে কি?

২ : "মাঝ রাতে যখন…"

'যোগাযোগে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানোর আগে বিকেলবেলায় সলতে পাকাতে হয়। স্বাধীনতার ছ'মাস আগেই (১৯৪৭ : ২২ জানুয়ারি) প্রতিজ্ঞা-পত্র রচিত হয়েছিল :

"এই গণ-পরিষদ্ ভারতকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ভবিষ্যৎ শাসনের জন্য এমন একটি রাষ্ট্রনীতি রচনা করিতে মনস্থ …"

এবার মূল সূত্রগুলির কথা :

(১) বৃটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি, দেশীয় রাজ্য ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন ;

(২) কয়েকটি বিষয় ছাড়া এই সব অঞ্চলগুলির অন্যান্য ব্যাপারে স্বাধীন শাসন-ক্ষমতা ;

(৩) জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ;

(৪) আইন ও নীতিসঙ্গতভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, স্বাধীন মতপ্রকাশ ও ধর্মানুসরণ এবং সুযোগ-সুবিধার সাম্য ;

(৫) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ও নানাপ্রকার নিম্ন ও অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ;

(৬) সভ্যজাতির নিয়মানুসারে রাষ্ট্রের অখণ্ড ও সার্বভৌম দাবীর অক্ষুণ্ণতা ;

(৭) পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে যোগ্য সম্মানলাভ ও বিশ্বশান্তি এবং মানবতার কল্যাণে অবদান।

১৬ই অগস্ট ১৯৪৬ এনেছিল বর্বরতার যুগ, রক্তের ঢেউ, ১৫ই অগস্ট ১৯৪৭ আনল স্বাধীনতা! ইতিহাসের পট-পরিবর্তন, নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ। ভারত ও পাকিস্তান! ১৫ই অগস্টের ভোরবেলায় লক্ষ লক্ষ লোক দেখল নিজের দেশের বহু পুরানো বাসভূমিতে হঠাৎ তারা বিদেশী হয়ে গেছে। তাদের কাছে প্রথম দিনেই বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে গেল। কী হবে পতাকা তুলে, কী হবে আলো জেলে? তল্পি-তল্পা বাঁধো : যাত্রা শুরু। দিল্লির লাল কেল্লায় মহা সমারোহ, কিন্তু যারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে প্রথম ডাক তুলেছিল 'দিল্লি চলো!' তাদের অনেকেই রাতারাতি হল স্বদেশে বিদেশী। পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম পাঞ্জাব।

সাত নম্বর প্রতিজ্ঞা-সূত্রটির বিপদ ঘনিয়ে এল।

নয়া দিল্লির রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকায় পণ্ডিত নেহরু, করাচিতে কায়েদে আজম। কিন্তু নাট্যকার অ্যাটলি আর পরিচালক মাউন্টব্যাটেন্।

১৪-১৫ অগস্টের মধ্যরাত্রে নেহরু স্বাধীনতাকে অভিনন্দন করে বললেন :

"মাঝ রাতে যখন পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে, তখন ভারত জেগে উঠবে প্রাণ ও স্বাধীনতার মাঝে। আজ আমরা শেষ করেছি দুর্ভাগ্যের যুগ, ভারত আবার নিজেকে আবিষ্কার করেছে। অতীতের সমাপ্তি হল ;

ভবিষ্যৎ এখন হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে। ভারতের সেবা মানে যে কোটি কোটি লোক দুঃখ ভোগ করছে তাদেরই সেবা। তার মানে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, রোগ ও অসাম্যের শেষ।"

মাউণ্টব্যাটেনের উক্তি : "দু'বছর আগে যুদ্ধে জয় হয়েছে। কিন্তু ভারতে আমরা মহত্তর কায করেছি—বিনা যুদ্ধে শান্তির চুক্তি।"

কায়েদে আজম্ জিন্না :

"যে অভূতপূর্ব বিদ্রোহ এই বিরাট উপমহাদেশে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল তাতে শুধু আমরা নয় সারা পৃথিবী বিস্মিত হয়েছে। আর আমরা তা সম্ভব করেছি শান্তির মধ্যেই। আমি জানি এমন অনেক লোক আছে যারা ভারত বিভাগে রাজী নয়। আমি মনে করি ইতিহাস যখন তার রায় দেবে তখন এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে বিভাগই ছিল সমস্যার একমাত্র সমাধান। অখণ্ড ভারতের কল্পনা কখনো কার্যে পরিণত হত না, এবং আমার বিচারে তাতে ভীষণ বিপর্যয়ই ঘটত।"

মাউণ্টব্যাটেনের শুভেচ্ছা : "পাকিস্তানের জন্ম এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পিছনে ফিরে তাকাবার সময় নেই; সময় আছে শুধু সামনের দিকে তাকাবার। চিরকাল পাকিস্তানের উন্নতি হোক।"

মহাত্মা গান্ধী নয়া দিল্লিতে নেই। অভিযান তাঁর শেষ হয়নি; মহাত্মা বেলেঘাটায় হিন্দু মুসলমানের প্রীতি-মিলনে অংশ নিয়েছেন।

১০ই অগস্ট থেকেই লাহোরের পথে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। ১৫ই অগস্ট স্বাধীনতার সূর্য উঠল পৈশাচিক ধ্বংসলীলার মধ্যে: আগুন আর ধোঁয়া, চীৎকার আর রক্তপাত, হত্যা আর ধর্ষণ।

মাউণ্টব্যাটেনের ১৪ই অগস্টের উক্তি :

"কয়েক দিন আগে লাহোরে গিয়েছিলাম। সংবাদ যা পেয়েছিলাম তাতে মনে হয়েছিল যে তুলনাহীন ধ্বংসের দৃশ্য দেখব। শুনে আশ্বস্ত হবেন আপনারা যে যা মনে করেছিলাম তার চেয়ে অনেক কম ধ্বংস হয়েছে।"

কিন্তু তবু আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে অগস্টের এই মাঝ রাতটি একটি অতুলনীয় স্মরণীয় ঘটনা। ভালো হোক, মন্দ হোক, শুধু ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করলেই বোঝা যায় পৃথিবীর গতিপথে মোড় এসে গেছে। হয়তো মাঝ রাতে শতাব্দীর নতুন সম্ভাবনা অলক্ষ্যে সূচিত হয়েছে। মানুষ ভবিষ্যৎ জানতে পারে না; ঊর্ধ্ব আকাশ মৌন, নিরুত্তর।

মধ্য রাত্রের এই ঐতিহাসিক জাগরণ ভারতকে কোন পথে নিয়ে যাবে?

ভারত যদি ক্যাসানড্রা হত, তাহলে হয়তো গ্রীক নাটকের ভাষায় বলে উঠত:

এ কোন অজানা পথে নিয়ে এলে, অ্যাপোলো আমার!

৩ : দাঙ্গা, দাঙ্গা, আরো দাঙ্গা

দু' পক্ষের কর্তারা বললেন : "সমস্যার সমাধান এতো দিনে হয়েছে। যার জন্যে তোমরা এতো দিন খুনোখুনি করেছ তা তো হয়েছে—স্বাধীনতা আর বিভাগ। এখন তো আর গণ্ডগোলের কোনো কারণ নেই। যে-যেখানে আছো থাকো। ঠাঁই-নাড়া হয়ে কেন কষ্ট পাবে, বাপু? সংখ্যালঘিষ্ঠদের আমরা সব সুবিধা দেবো, কোনো চিন্তা নেই।" কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠরা ভাবল : "ভয় তো নেই এঁরা বলছেন, কিন্তু ভরসাই বা কোথায়? তার চেয়ে সময় থাকতে তোড়-জোড় করা ভালো।" এদিকে গভর্ণমেণ্ট-চাকুরে যাঁরা, তাঁরা সরেছেন যে যার সম্প্রদায়ের দিকে। সৈন্যসামন্তদের মধ্যেও ভাগাভাগি ব্যবস্থা। সংখ্যা-লঘিষ্ঠরা চিন্তিত হল। কিন্তু উপায় কী?

১৪ই অগস্ট যখন লাহোরে দেয়ালে-ঘেরা সহরের বাইরে ও ভিতরে বীভৎস ব্যাপার চলেছে তখন কলকাতায় বিকেলবেলায় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল : খুনোখুনি নয়, হাতাহাতি নয়, গলাগলি মিলন। ব্যাপারটা এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে হল যে দু'পক্ষেরই প্রায় নেশা লেগে গেল। কলাবাগান, রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস্; বালিগঞ্জ, বড়বাজার, বাগবাজার : হিন্দু-মুসলমানের সীমানা উঠে গেল। পরদিন

স্বাধীনতার উন্মাদনা : পৃথিবীর কোনোখানে এমন ব্যাপার হয়েছে বলে মনে হয় না।

তবু মন থেকে সন্দেহ যায় না। ভাবতে ও পাকিস্তানে অন্যান্য জায়গায় কী হচ্ছে কে জানে? ধীরে ধীরে খবর আসছে : অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে নরক নেমেছে, পূর্ব পাঞ্জাবেও আগুন জ্বলেছে। হঠাৎ ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতায় দাঙ্গা লেগে গেল; গান্ধিজী তখনো কলকাতায়। কিন্তু শান্তিপ্রিয় বাঙালী এবার মরিয়া হয়ে ঠিক করেছে যে দাঙ্গা হতে দেবে না। শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে যারা প্রাণ দিল তাদের বীরত্বের তুলনা ইতিহাসে বিরল। গান্ধিজী অনশন শুরু করেছেন। "গান্ধিজীকে বাঁচাতে হবে।" "দাঙ্গা যদি করতে চাও বাংলা থেকে বেরিয়ে যাও।" ১লা সেপ্টেম্বর রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হল, বৃষ্টি আর থামে না। পরদিন কলকাতায় অনেক রাস্তাই নদী হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই জানে কলকাতায় সেপ্টেম্বরের দাঙ্গা থামাতে আকাশ-দেবতা অনেক সাহায্য করেছিলেন। বাংলাদেশ বেঁচে গেল।

কিন্তু পাঞ্জাব? সিন্ধু? উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত? দিল্লি? দেশীয় রাজ্য? দাঙ্গা, দাঙ্গা, আরো দাঙ্গা। পাঞ্জাবের দাঙ্গার তুলনা নেই—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভাবে বিধ্বস্ত ও বাস্তুহারা দল মিছিলের মতো কোথাও পথে নামেনি। মানবতার এমন শোচনীয় অপমান আর কখনো ঘটেছে কি না সন্দেহ। পাঞ্জাবের এই বর্বরতার মূলে অনেক কারণ রয়েছে। বহুদিন ধরে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও হিংসা পাঞ্জাবের মাটিতে বিষ-বৃক্ষের মতো গজিয়ে উঠেছে। তারপর হল পাকিস্তান-লাভের জন্য পৈশাচিক চেষ্টা। প্রদেশ-বিভাগের সিদ্ধান্ত, সীমানা-নির্ধারণের

অনিশ্চয়তা, আরো অনেক ব্যাপার স্বাধীনতার আগেই পাঞ্জাবীদের মন অস্থির করে তুলেছিল। গভর্ণমেণ্ট-চাকুরেদের বিষাক্ত মন, পুলিশের বিষাক্ত মন আর সেনাদলের বিভাগ এই দাঙ্গার মূলে বিশেষভাবে কাজ করেছিল। এ ছাড়া, গুজব ও বিশেষ করে মুস্‌লিম্‌-লীগ্‌পন্থীদের নৃশংস প্রচার-কার্য ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিশ্চিহ্নভাবে লোপ করার চেষ্টা তো ছিলই। সার্‌ ইভ্যান্‌ জেঙ্কিন্‌স্‌ ও জেনারেল্‌ রিস্‌ প্রভৃতি ব্রিটিশ প্রভু ও তাঁদের অনুচরেরাও এই ধ্বংসের জন্য বিলক্ষণ দায়ী। যে-সব সাংবাদিকেরা নেহরু ও লিয়াকৎ আলির সঙ্গে সফরে বেরিয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই লিখেছেন—"পশ্চিম পাঞ্জাবে আইন ও শাসন বলতে সত্যিই কিছু নেই। সেখানে চলেছে অভাবনীয় অরাজকতা। পূর্ব পাঞ্জাবও প্রতিশোধ নিয়েছে শাসন-দায়িত্ব অস্বীকার করে।" জাফ্‌রুল্লা খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন: "পূর্ব পাঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গুলিতে আর বেয়নেটের খোঁচাতেই মুসলমানেরা বিধ্বস্ত হয়েছে।" হিন্দুস্থান টাইম্‌সের সংবাদদাতা ও আরো বহু দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তির মত: "গত তিন সপ্তাহে পশ্চিম পাঞ্জাবে হতাহতের শতকরা পঁচাত্তরটির জন্য দায়ী সৈন্যদল ও পুলিশের লোক। হাজার হাজার লোক তাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। তাদেরই হাতের কাজ অর্থাৎ শেখুপুরার নরহত্যা জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংসতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আবার শেখুপুরার ব্যাপারকেও লজ্জিত করেছে শকরগড় তহশীলের বীভৎস কাণ্ড।" পূর্ব পাঞ্জাবের হয়তো কিছু বক্তব্য আছে। একটা সম্পূর্ণ নতুন প্রদেশ হঠাৎ দাঙ্গার বীভৎসতায় তার শাসনভারকে বিপন্ন অবস্থায় দেখল। ১৭০০০ পুলিশের লোকের পরিবর্তে পুলিশের

লোক এসেছে তখন মাত্র ৩০০০। নতুন শাসনকর্তার বিশেষ অভিজ্ঞতাও ছিল না। সাধারণ ধারণা এই যে মাউণ্টব্যাটেন্ ভারতবিভাগের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ততা অবলম্বন করেই ভুল করেছিলেন; তারই ফলে সীমানারক্ষীদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে তারা দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। ব্রিটিশ অফিসারদের ঔদাসীন্য ও নিষ্ঠুরতাও এর জন্যে দায়ী। সাহায্য চাইতে গেলেই তারা বলেছে: "স্বাধীনতা চেয়েছিলে তো তোমরা? এখন নাও।"

পাঞ্জাবের দাঙ্গা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল নানা জায়গায়—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের কাছাকাছি দু'পক্ষের দেশীয় রাজ্যে। চারদিকে শুধু হত্যা, লুট, আগুন, ধর্মান্তর, নারীহরণ আর ধর্ষণ। লক্ষ লক্ষ লোক স্বাধীনতার প্রথম মাস থেকেই ভিটে-মাটি ছেড়ে দলে-দলে দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়েছে জীবন বিপন্ন করে জান-মান বাঁচাতে। বিভক্ত দেশের স্বাধীনতার মূল্য দিল লক্ষ লক্ষ মৃত ও মৃতপ্রায় নরনারী। কায়েদে আজম্ বললেন—"আল্লার কৃপায় আমরা শান্তির মধ্যেই স্বাধীনতা এনেছি।" একটি নিপীড়িতা পাঞ্জাবী মেয়ে নেহরুজীকে বলল—"নেতা হয়ে আপনারা আমাদের এই চরম দুরবস্থার ব্যবস্থা কী করে করলেন?" পণ্ডিতজী নিরুত্তর। ভারতে ও পাকিস্তানে বারে বারে লক্ষ লক্ষ নরনারী শুধু এই প্রশ্নই করেছে, নিজেদের নেতাদের উদ্দেশেই গাল দিয়েছে, অভিশাপ দিয়েছে নবলব্ধ স্বাধীনতাকে।

দিল্লির দাঙ্গা পাঞ্জাবের সঙ্গে জড়িত হলেও এর ব্যাপার অন্য রকম। দলে দলে আশ্রয়প্রার্থী এসে তাদের দুর্ভোগের কাহিনী ছড়াল দিল্লি সহরে। যখন দাঙ্গা আরম্ভ হল সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। প্রায়

যুদ্ধেরই মতো। মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্রে এমন ভাবে সুসজ্জিত কেমন করে ছিল তার রহস্য বোঝা কঠিন। মাটির তলায়, সুড়ঙ্গে, মস্‌জিদে, দিল্লির বহুপুরানো বাড়িতে সুরক্ষিত দুর্গের মতো ব্যবস্থা; বেতারযন্ত্রে খবর পাঠানো, এমন কি এরোপ্লেনের সঙ্কেত। বহু কষ্টে সামরিক সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হল। তারপর দিল্লি জেলায় যে নৃশংস দাঙ্গা চলল তা পাঞ্জাবেরই পুনরাবৃত্তি। কলকাতা থেকে গান্ধিজী গেলেন দিল্লিতে, কলকাতা থেকে গেল সেবাদল দিল্লিতে ও পূর্ব পাঞ্জাবে—দুঃস্থের সেবায় বাঙালীই চির-অগ্রণী।

১৯৪৭এর শীতের দিনগুলো বড়ো দুঃখের মধ্যে কেটেছে। লক্ষ লক্ষ আশ্রয়হীন নরনারী ও শিশু রোগে শোকে অপমানে অনাহারে অযত্নে পথে পথে ভারতে ও পাকিস্তানে ঘুরেছে। মরেছে অসংখ্য লোক; যারা মরেনি তাদের নৈতিক মৃত্যু ঘটেছে। যুদ্ধ না করে এতো বড়ো দেশের স্বাধীনতালাভ নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়: কিন্তু তথাকথিত শান্তির মধ্যে এতো বড়ো সর্বনাশা ঘটনারও তো তুলনা খুঁজে পাই না। শুনি: 'ওঅর ইজ দি ক্লিনেস্ট কাইণ্ড্ অফ হেট্‌রেড্'; তার নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে, মূলে কিছু নাকি আদর্শবাদও আছে। কিন্তু দাঙ্গা? এর মতো ভয়াবহ, বীভৎস, পাশবিক ব্যাপার কল্পনা করা যায় না। সারা জীবন যারা আপন জন বলেই পরিচিত সেই সব চেনা মুখে হঠাৎ হিংসার অগ্নি-আভা, লোভের রেখা, রক্তের লালসা, কুৎসিত যৌন বাসনা! দাঙ্গার ঘটনা একটার পর একটা শুনলে মনে হয় কল্পনাতীত নরকে বাস করছি। কিন্তু শুধু ঘটনা ও বাস্তব ক্ষতির পরিমাণ করে দাঙ্গার হিসাব হয় না। মনের অবস্থা? অসহায় উলঙ্গ

ভয়, উন্মত্ত ক্রোধ, বিষাক্ত বিষণ্ণতা, মুহূর্তে মুহূর্তে সর্বনাশের প্রতীক্ষা, আগুনে ও ছুরিতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত, কামুক পশুর সামনে অপহৃতা নারীর শেষ প্রতিবাদ-চীৎকার, চোখের সামনে প্রিয়জনের অমানুষিক মৃত্যু, সাজানো সংসার জ্বলে যাওয়া, পথে ঘাটে কুকুরের মতো অনাদর—যাদের এসব অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের কাছে স্বাধীনতা হয়েছে একটা অশ্লীল অমানুষিক ব্যঙ্গ। তারা আমাদেরই আপনজন, তাদের সংখ্যা কম নয়।

আর, স্বাধীনতার সব চেয়ে বড় সমস্যা আজ আমাদের কাছে, অন্তত মানবিকতার দিক দিয়ে, এই আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে-আনা। গজনফর্ আলি খাঁ স্বীকার করেছেন যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু-শিখদের ধ্বংস করে পশ্চিম পাঞ্জাব আজ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ভারত ও পাকিস্তানের বড়ো বড়ো সহরগুলো লোকের চাপে ফেটে পড়ছে—ন স্থানং তিলধারণম্। এতো লোক কোথায় থাকবে? কী খাবে? তাদের কাজ কোথায়, কোথায় জীবিকা? যারা চলে গেল তাদের স্থান অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করা চলে না। লোক মরছে, রোগ বেড়েই চলেছে। অসন্তোষের আগুন জ্বলেছে, এদের দাবির অন্ত নেই, কাঁদুনে-গ্যাস্ আর গুলি চালিয়েও এদের থামানো যায় না। এদের কাজ, এদের খাবার জোটাতে গিয়ে সাধারণ স্বাভাবিক লোক কষ্ট পাচ্ছে। কতো দিন আর 'আহা!' বলে সহানুভূতি দেখানো যায়। পাকিস্তানী হিন্দু আর ভারতীয় মুসলমান আজ ভারতে ও পাকিস্তানে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান কিছুদিন পরেই ভারতীয় মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। সেখানে মুসলমানদের মধ্যেই অসন্তোষ; অনেকেই চলে আসতে চায়। হিন্দুরা তো প্রায় সকলেই চলে এসেছে।

কিন্তু ক্রমশ আশ্রয়প্রার্থীদের চাপে ভারতীয় কর্তারাও আর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লোক আসা পছন্দ করছেন না।

ঘটি-বাঙালে বিরোধ, হিন্দু-শিখে বিরোধ, পাঞ্জাবী-অপাঞ্জাবীতে বিরোধ। জেনারেল্ মোহন সিং নাকি ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করেছেন। নান্‌কানা-সাহিব হারিয়ে দাঙ্গাজর্জর শিখেরা নাকি তাদের জন্যও 'স্তান' চায়।

এদিকে জিনিস-পত্রের দামও বেড়ে চলেছে, অপরাধীর সংখ্যাও। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা নিষ্ঠুর। কী বিরাট ভাবে ও অভাবনীয় মূর্তিতে নৈতিক অবনতি ঘটেছে তা কল্পনা করা যায় না। নৈতিক অধঃপতন শুধু আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, সারা সমাজের দেহে দূষিত ক্ষতের মতো ছড়িয়ে গেছে।

জড়চেতনায় ধীরে ধীরে অনুভূতির সঞ্চার হচ্ছে। ইতিহাসের বিশ্রাম নেই, কার্য-কারণের শিকল বেড়েই চলেছে। পাতার পর পাতা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় সকলের অলক্ষ্যে রচিত হয়ে চলেছে।

পাকিস্তান-পরিষদকে আবাহন করে মাউণ্টব্যাটেন্ বলেছিলেন—"ইতিহাস কখনো নড়ে তুষারস্রোতের অপরিমেয় ধীরগতিতে, কখনো বা ছুটে চলে খরধারা নদীর মতো।"

কী হবে আগামী দিনে ইতিহাসের ভঙ্গী?

৪ : 'হিন্দুস্থান হমারা'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্', রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন', ইক্‌বালের 'হিন্দুস্থান হমারা'।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোনো দেশে ভারতের এই জাতিগত পার্থক্য জানা ছিল না। 'হিন্দু' বললে 'ভারতবাসী' বোঝাতো, 'হিন্দুস্থান' মানে গোটা ভারত। ইক্‌বাল তাই গেয়েছিলেন—'হিন্দুস্থান হমারা'। কোথায় গেল গ্রীস্, রোম, মিশর? কিন্তু আজও রয়েছে হিন্দুস্থান হমারা! সেই বহুপ্রাচীন দেশ হল, কায়েদে আজমের দাবিতে ও চেষ্টায়, বিংশ শতাব্দীর দুই নতুন রাষ্ট্র—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। যেসব ভারতীয়েরা বিভাগের সময়ে লণ্ডনে ছিলেন তাঁরা সকলেই লক্ষ্য করেছেন কী চাপা আনন্দে ইংরেজের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মুখেও তারা বলেছে—"হ্যাট্‌স্ অফ্ টু জিন্না!" আর নয়া দিল্লিতে ভারতপিতা শীর্ণ সন্ন্যাসী শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

বিভাগে কী পেলাম? একটা তুলনামূলক হিসাব করা যাক। নিখুঁত হিসাব অবশ্য সম্ভব নয় নানা কারণে। এখনো কয়েক জায়গায় সীমানা ভালো ভাবে নির্ধারিত হয়নি। দু'পক্ষের ভাগ-বাঁটোয়ারা আজও

অনেক ব্যাপারেই অস্পষ্ট। দু'পক্ষের আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থান ও সম্পত্তি অনিশ্চিত। তারপর হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর; অদূর ভবিষ্যতে নিষ্পত্তির আশা নেই। ১৯৪১এর লোকগণনা ও যাবতীয় হিসাব আজ এতোদিন পরে চলতে পারে না। তবু একটা মোটামুটি খসড়া করা যাক।

(১) লোকসংখ্যা ও আয়তন

ভারত : ২৯৭, ৫৪২, ০০০ ; পাকিস্তান : ৭১, ০৯৬, ০০০।

ভারত : ১,০৫৫,৬২১ বর্গমাইল ; পাকিস্তান : ৩৬১,২১৮ বর্গমাইল।

হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা আছে।

(২) পথ-বন্দর ইত্যাদি

রেলপথ : ভারত : ৩৪,২৫০ মাইল ; পাকিস্তান : ৭,৭৫০ মাইল।

পথ : ভারত : ৩২১,২৮৫ মাইল ; পাকিস্তান : ২৮,৭১৫ মাইল।

বন্দর : ভারত : বোম্বে, কলকাতা, কোচিন, মাদ্রাজ, ভিজাগাপত্তম।
পাকিস্তান : করাচি, চট্টগ্রাম।

খাল : ভারত : সর্দা (যুক্তপ্রদেশ) ; পাকিস্তান : সুক্কুর (সিন্ধু)।
শতদ্রু উপত্যকার খাল ভাগ হয়েছে।

বিমানবহর আশ্রয় : ভারত : ১৫ ; পাকিস্তান : ৪।

বাঁধ ও জলাধার : ভারতের বোম্বে ও মাদ্রাজেই সবচেয়ে বড়ো আছে। এ ছাড়া পূর্ব পাঞ্জাবে ভকরা, পশ্চিম বঙ্গে দামোদর, উড়িষ্যায় হীরাকুড্, মাদ্রাজে তুঙ্গভদ্রা ইত্যাদি পরিকল্পনা রয়েছে।

পাকিস্তানে আছে থল্ পরিকল্পনা। হায়দ্রাবাদে একটি বড় বাঁধ আছে।

(৩) কৃষিজ দ্রব্য

চাল : ১৯৪৪-৪৫এর হিসাবে ২৭,১২২,০০০ টনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভারতের ; বাকি পাকিস্তানের।

গম : ১৯৪৪-৪৫এর হিসাবে মোট ১০,৪৫৮,০০০ টন। এর অর্ধেকের বেশি পাকিস্তানে।

তামাক, চিনি, ডাল, জওর, বজরা, বার্লি, ওট্, কফি, বাদাম ইত্যাদির প্রায় সমস্তটাই ভারতে উৎপন্ন হয়।

চা : ভারতে শতকরা ৮৫ ভাগ, পাকিস্তানে শতকরা ১৫ ভাগ।

পাট : ভারত ১৯৪৬এর হিসাবে উৎপাদন করেছে ১,৪১১,৮১০ বেল্, পাকিস্তান করেছে ৫,৪১৬,১১৫ বেল্। পাকিস্তানের পাট অনেক ভালো ; কিন্তু পাটকল প্রায় সবই ভারতে।

তুলা : ভারত তুলার প্রায় সবটাই উৎপাদন করে ; পাকিস্তানে হয় প্রায় শতকরা ৯ ভাগ। এ ছাড়া আরো যেসব কৃষিজদ্রব্য (রবার্ ইত্যাদি) উৎপন্ন হয় তার প্রায় সবটাই ভারত পেয়েছে।

(৪) খনিজপদার্থ ও প্রাকৃতিক শক্তি

কয়লা : ভারত : ২৪,৬০০,০০০ টন ; পাকিস্তান : ৪০০,০০০ টন।

লোহা : ভারত : ২,৭৪৩,৬৭৫ টন ; পাকিস্তান : শূন্য।

পেট্রোল : ভারত : ৬৯,৫০০,০০০ গ্যালন ; পাকিস্তান : ১০,৫০০,০০০ গ্যালন।

সোনা : ভারত : ৩২১,১৩৭ আউন্স ; পাকিস্তান : শূন্য।

ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, সীসা, তামা, ক্রোমাইট্, হীরা, থোরিয়াম্ ইত্যাদি বহুপ্রকার খনিজ দ্রব্য ভারতেই উৎপন্ন হয়।

লবণ : ভারত : ১,২৩৫,২৪৫ টন ; পাকিস্তান : ৩০৪,৪১৮ টন।

জল-বৈদ্যুতিক শক্তি : এর বেশির ভাগ সম্ভাবনাই বর্তমানে আছে ভারতে।

(৫) কলকারখানা

কাপড়	ভারত :	৪১৯ ;	পাকিস্তান :	৪
পাট	ভারত :	১০৭ ;	পাকিস্তান :	০
সিল্ক	ভারত :	৬৫ ;	পাকিস্তান :	৪
পশম	ভারত :	১৮ ;	পাকিস্তান :	০
লোহা ও ইস্পাত	ভারত :	১৩ ;	পাকিস্তান :	০
যন্ত্রপাতি ও জাহাজ তৈরি ...	ভারত :	১০০৬ ;	পাকিস্তান :	০
চিনির কল	ভারত :	১৭০ ;	পাকিস্থান :	৫
কাগজ ও ছাপাখানার কারখানা	ভারত :	৪৮০ ;	পাকিস্তান :	৯
কাঁচ	ভারত :	৬০ ;	পাকিস্তান :	৩
চামড়া	ভারত :	৭৩ ;	পাকিস্তান :	০

রাসায়নিক-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বহু শ্রমশিল্পের কারখানা শুধু ভারতেই আছে।

(৬) অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারতের খাদ্যশস্যের সম্পদ প্রচুর হলেও খাদ্যাভাব হবে নানা কারণে, কিন্তু পাকিস্তানের বাড়তি হবে ১০ লক্ষের টনের উপরে। ভারতের নিজের জন্য পাট যথেষ্ট থাকলেও পাকিস্তানের উপর নির্ভর করতে হবে চটকল চালাবার জন্য। কাপড়, কয়লা, লোহা ও অন্যান্য বহু দ্রব্যের জন্য

ভারতের কাছে পাকিস্তান প্রার্থী হবে। খাদ্যসমস্যাই হবে ভারতের প্রধান সমস্যা। বৈদ্যুতিক শক্তি বর্তমানে ভারতেই আছে বেশি; তার বৃদ্ধিরও চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হলে পাকিস্তানের জল-বৈদ্যুতিক শক্তি ভারতের চেয়ে বেশি হতে পারবে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবে না; পরস্পর সহযোগিতা ও পৃথিবীর অন্য দেশের কাছ থেকে সাহায্যলাভও বিশেষ প্রয়োজন হবে।

(৭) সামরিক অবস্থা

ভারতীয়দের রণদক্ষতা পৃথিবীতে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। কিন্তু সমগ্র সামরিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সাম্প্রদায়িক প্রথায় ও অন্যান্য কয়েকটি ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। তার ফলে নৈপুণ্য যে খানিকটা কমবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিখ্যাত গুর্খা সৈন্যবাহিনীর অনেকগুলো অংশ ভারত পেয়েছে এবং কয়েকটা গেছে খাস ব্রিটিশ রাজের হাতে। সামরিক ব্যাপারে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো দৌর্বল্য এই যে তার পূর্বভাগ ও পশ্চিম ভাগে কোনো সম্পর্কই নেই। ভারতের সীমানাও বিশাল, বিশেষত দীর্ঘ জলরেখা: এজন্য ভারতের স্থলবাহিনী ও নৌবহর যথেষ্ট নয়। পাকিস্তানের কাছে নৌবহর ততোটা প্রয়োজনীয় নয় বর্তমানে। বিমানবহরে পাকিস্তান বিশেষ দুর্বল, যান্ত্রিক বাহিনীতেও। পাকিস্তানের পক্ষে তার পদাতিক যথেষ্ট, কিন্তু সামরিক ব্যয়ভার বহন করা দুরূহ। যদি কখনো এই দুটি রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধে, দুটিরই বিপদ চরম হবে নানা কারণে। যদি বহিঃশত্রু দ্বারা একটি আক্রান্ত হয়, তাহলে অপরটিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হবে। সামরিক অবস্থানের দিক

দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সব চেয়ে খারাপ—গোটা বাংলা দেশটারই। পঞ্চম বাহিনীর দুশ্চিন্তা ভারতেরই বেশি। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের যুগে পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলির তুলনায় ভারত ও পাকিস্তান অত্যন্ত দুর্বল।

(৮) দুটি প্রদেশ : পূর্ব ও পশ্চিম

ত্রিকোণ ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম কোণে ভাগ হয়েছে। ফল—পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম বঙ্গ। এদের সমস্যা আজ নানা কারণে এতো জটিল যে ভারত গভর্ণমেণ্ট এদের সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রায় ছেড়ে দিতে চান।

পশ্চিম বঙ্গ : ২৮০০৩ বর্গমাইল। এখন লোকসংখ্যা গণনা করলে আড়াই কোটি হওয়া বিচিত্র নয়। বর্ধমান বিভাগ সম্পূর্ণ আছে; প্রেসিডেন্সি বিভাগ থেকে খুলনা গেছে, আছে যশোহরের সামান্য, নদীয়ার অনেকটা। এছাড়া আছে কলকাতা, ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ির প্রায় সবটা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুরের খানিকটা এবং দার্জিলিং। কিন্তু উত্তরাংশের সঙ্গে সংযোগ নেই।

পূর্ব পাঞ্জাব : জলন্ধর বিভাগ, আম্বালা বিভাগ ও লাহোর বিভাগের খানিকটা। গুরুদাসপুর জেলা পাওয়ার জন্যই কাশ্মীরের সঙ্গে সংযোগ রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে লোক সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি।

৫ : কাশ্মীর : হায়দ্রাবাদ : জুনাগড়

ভারত যখন ইংরেজের দখলে আসে তখন এই ছিন্ন ভিন্ন ছড়ানো বিরাট দেশকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক অধিকারে আনা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া রাজত্ব করবার ব্যাপারে অনেক নবাব ও মহারাজার সহায়তার দরকার হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্বের মূলে রয়েছে এই আপোষ। তাই ভারতের মানচিত্র ও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা এমন জটিল। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ। দুটির অবস্থাই অনেকটা এক রকম: কাশ্মীর মুসলমান-প্রধান দেশ, কিন্তু এর মহারাজা হিন্দু; হায়দ্রাবাদ হিন্দুপ্রধান দেশ, কিন্তু নিজাম মুসলমান। কাশ্মীর পাকিস্তানের মধ্যে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তার সামান্য; হায়দ্রাবাদ ভারতীয় সীমানায় ঘেরা, পাকিস্তানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। সমুদ্রে বেরোবার পথ দুজনেরই বন্ধ। কিন্তু দুজনের মধ্যে আবার প্রভেদও আছে : হায়দ্রাবাদ বিশেষ শক্তিশালী রাজ্য, হায়দ্রাবাদের কৃপণ নিজাম পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম। কাশ্মীরের শক্তি ক্ষীণ, মহারাজার দীর্ঘ অত্যাচারে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সম্ভাবনা, বিশেষত পাঞ্জাবের সান্নিধ্যে। কিন্তু কাশ্মীরে আছেন শেখ আবদুল্লা; হায়দ্রাবাদে এমন ব্যক্তিত্বশালী নেতার

অভাব। শত বাধা ও আসুরিক অত্যাচার সত্ত্বেও কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে ; হায়দ্রাবাদ আজ এক বছর ধরে কূটনীতির চক্র ঘুরিয়ে সোজা কথায় বিদ্রোহ এখন করেছে। কাশ্মীরের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের উপর, আয়তন প্রায় ৮৬০০০ বর্গ মাইল, আয় প্রায় ২॥০ কোটি টাকা। হায়দ্রাবাদের লোকসংখ্যা ১॥০ কোটির উপর, আয় প্রায় ৮॥০ কোটি টাকা, আয়তন প্রায় ৮৩০০০ বর্গ-মাইল। এই হল ১৯৪১ এর খবর। হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ ভারতে ; কাশ্মীর উত্তরে, পশ্চিমের কাছাকাছি।

কাশ্মীর ও সেই সঙ্গে জড়িত জম্মুর ইতিহাস বড়ো জটিল। বর্তমানে প্রধান বিভাগগুলি হচ্ছে কাশ্মীর, জম্মু (লাডাখ ও বলুটিস্তান সমেত) এবং গিল্‌গিট্‌। ১৯৪৬এ কাশ্মীরে মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সে-আন্দোলনের নেতা ছিলেন শেখ আবদুল্লা। তাঁকে সহায়তা করতে গিয়েই কাশ্মীর সীমান্তে পণ্ডিত নেহরু গ্রেপ্তার হন। আবদুল্লার কারাবাসের আদেশ হয়। পাকিস্তানের 'ক্' হচ্ছে কাশ্মীর। (পাঞ্জাবের 'পি'—উত্তরপশ্চিম সীমান্তের আফগানের 'এ'—কাশ্মীরের 'কে'—সিন্ধুর 'এস্'—আর বেলুচিস্তানের 'টান' নিয়ে ইংরেজিতে পা-ক্-ই-স্-টান। 'ই', মনে হয়, শ্রুতিমাধুর্যের জন্য যোগ করা হয়েছে।) পাকিস্তানের নজর কাশ্মীরের উপর চিরকাল। বিশেষত কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থানের রাজনৈতিক ও সামরিক মূল্য অসামান্য : কাশ্মীরকে ঘিরে আছে রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান ও ভারত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কাছে তাই কাশ্মীর বড়ো মূল্যবান। বিশেষত রাশিয়ার কাছ ঘেঁষে পাকিস্তানে ডেরা বাঁধার ইচ্ছা ইংরেজের কাছে খুবই স্বাভাবিক। একবার কথাও উঠেছিল যে ভারতের ইংরেজেরা সব গিয়ে কাশ্মীরে

বসবাস করবে, কারণ কাশ্মীর যে পাকিস্তানের হাতে থাকবেই এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। যুক্ত-জাতি-সংঘ (যেখানে ইঙ্গ-আমেরিকার প্রভুত্ব) সেইজন্যই কাশ্মীর সম্বন্ধে কখনো সুবিচার করতে পারে না। কাশ্মীর বিভাগের পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে। ৬ই অগস্টের 'ইকনমিস্ট' (বিলাতের নাম করা পত্রিকা) বলছেন: "ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের মৈত্রী স্থাপন করা ব্রিটেনের একান্ত প্রয়োজন……ঘোষণা না হলেও কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ চলেছে……কাশ্মীর-বিপর্যয়ের প্রথম অবস্থায় পাকিস্তানের দোষ থাকলেও অমীমাংসার দোষ এখন ভারতেরই বেশি……বোধ হয় শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে কাশ্মীর-বিভাগ ও লোকবিনিময়।" যুক্ত-জাতি-সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা তদন্ত শেষ করে যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা করছেন। পাকিস্তান খোলাখুলি যুদ্ধ করছে। বিভাগের কথাও নিশ্চয়ই উঠেছে। শেখ আবদুল্লার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় এই কথাই মনে হয়।

জিন্না চিরকালই জনসাধারণকে উপেক্ষা করে দেশীয় রাজ্যের প্রভুদের প্রাধান্য স্বীকার করে এসেছেন। কাশ্মীর সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ছিল না। প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র কাক ও তাঁর ইংরেজ স্ত্রী কংগ্রেস-বিরোধী: ভারত-বিভাগের সিদ্ধান্ত হতেই তাঁরা মহারাজাকে পাকিস্তানে যোগদান করতে পরামর্শ দেন, এমন কি গোপনে পাকিস্তানের কর্তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালান। কাক এখন কারারুদ্ধ, বিচারে অনেক গোপন খবরই মিলবে। যাই হোক, কাশ্মীরের ইতিহাসে ভাগ্যের খেলা শুরু হল। মুসলিমলীগের পত্রিকা "পাকিস্তান টাইমস" সোজাসুজি কাশ্মীরকে পাকিস্তানে যোগ দিতে আদেশ জানাল। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক ত্রিলোকীনাথ রায়না জানাচ্ছেন যে কাশ্মীর

অভিযানের অনেক আগে থেকেই পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লেখা হত। মহারাজা বিপদে পড়লেন, পাকিস্তানের ও মুসলিম-লীগের কার্যকলাপে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, দেশের লোকও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট, কংগ্রেসের সঙ্গেও তাঁর সদ্ভাব নেই। অতএব তিনি অগতির গতি যে সময়—তারই আশ্রয় নিলেন।

এদিকে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ পাঠান জাতিরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে রফা না করলে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ইপি-র ফকিরের হাবভাব ভালো নয়; আফগানিস্তানের ভঙ্গীও তদ্রূপ; তার উপর গফর খাঁর 'পাঠানিস্থান' আন্দোলন! কায়েদে আজম্ চিন্তিত এবং অবশেষে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন; আবার রক্তের আস্বাদে ও লোভে পাকিস্তানীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে—তাদের থামিয়ে রাখা কঠিন। শোনা যায় জিন্নাসাহেব ক্ষেপে উঠে-ছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য; বহুকষ্টে তাঁকে শান্ত করা হয়। কিন্তু এতোগুলো সমস্যার সমাধান কী করে হয়? যে সাম্প্রদায়িক আগুনের মধ্যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে তাকেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সমাধান হল কাশ্মীর। ভিতরে তাড়াতাড়ি তোড় জোড় চলল। স্লোগান হল: "জমি আমাদের, লুট তোমাদের।" ছুতো হল: "অত্যাচারী হিন্দু রাজার হাত থেকে বিপন্ন ইসলামের উদ্ধার করো।" কাশ্মীরের আকাশ মেঘে ঢেকে গেল।

হঠাৎ হাওয়া ঘুরল। র‍্যাডক্লিফ গুরুদাসপুর জেলার প্রায় সবটাই ভারতকে দান করে ফেললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পাঠানকোট রাস্তা—যে পথ দিয়ে ভারতের সাহায্য চলেছে কাশ্মীরে। সঙ্গে সঙ্গে

পাকিস্তানে সাড়া পড়ে গেল : আর তো দেরি করা চলে না, আক্রমণ আরম্ভ করতে হয়। মহারাজা এর মধ্যে মেহেরচাঁদ মহাজনকে করেছেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী, আর ঝগড়া চালিয়ে মহাজন পাকিস্তানের কাছ থেকে সময় নিচ্ছেন। এদিকে পাঠানকোট রাস্তা এগিয়ে চলেছে মাইলের পর মাইল। শীত বেশ, তবে বরফ-পড়া তখনো আরম্ভ হয় নি। মহারাজা এখনো ঠিক করতে পারছেন না কি করবেন। ২১শে অক্টোবর কাশ্মীর আক্রমণের দিন স্থির ছিল, কিন্তু একদিন দেরি হয়ে গেল। করাচীর 'ডন্' পত্রিকায় মেজর আনোয়ার্ জানিয়েছেন যে দুদিক থেকে কাশ্মীর আক্রমণ করা ঠিক ছিল—একটা উপজাতি এলাকা থেকে, আর একটা পাকিস্তানের সীমানা থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় দিকের আক্রমণ কার্যে পরিণত হয়নি।

কাশ্মীর আক্রমণ আরম্ভ হল : হানাদারবা বিশেষ বাধা পায়নি, রাজসৈন্যও ছিল সামান্য। মজঃফরাবাদ ও ডোমেলের মধ্যে প্রথম বাধা, তারপর উরির পথে আর বরমুলার কাছে। তিন জায়গাতেই হানাদারেরা জিতেছিল; কিন্তু সময় গেল, আরো সময় গেল লুট আর অত্যাচারে। ২৬শে অক্টোবর যখন হানাদারেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ও বরমুলার পথে ছুটে আসছে, যখন শ্রীনগর বিপন্ন তখন মহারাজা চিঠি লিখলেন ভারতীয় ইউনিয়নের কাছে—

"বর্বর পশুশক্তি অবাধে ছুটে আসছে শ্রীনগর দখল করতে...... চারদিকে তারা ধ্বংস করেছে......যে সব মেয়েদের তারা ধরে নিয়ে গেছে ও ধর্ষণ করেছে তাদের জন্য আমার বুক ভেঙে গেছে·· ভারতীয় ইউনিয়নের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা ছাড়া আর আমার কোনো উপায় নেই···আর এক পন্থা এই হানাদারদের হাতে আমার রাজ্য

ও প্রজা তুলে দেওয়া, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেবো না…আমার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে শেখ আবদুল্লা দায়িত্বভার নেবেন।"

ইতিহাসের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ!

২৭শে অক্টোবর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিশেষ করে বিমানবহর, কাশ্মীরকে সাহায্য করতে আরম্ভ করল। আজ প্রায় দশ মাস ধরে কাশ্মীর অভিযান চলেছে। অনেক জায়গা হানাদারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যুক্ত-জাতি সংঘের কাছে কাশ্মীর সমস্যা পেশ করা হয়েছিল, সমাধান হয়নি। প্রতিনিধিরা তদন্ত করে গেছেন। দুর্গম গিরিরাজ্যে, বরফের মধ্যে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতীয়-বাহিনী প্রশংসনীয় কাজ করেছে। বাঙালী ব্রিগেডিয়ার সেন, কর্ণেল রাই, মৃত ব্রিগেডিয়ার ওসমান প্রভৃতির নাম ভোলবার নয়।

২৫শে অক্টোবর শ্রীনগর সহর অন্ধকার : পাওয়ার হাউস নষ্ট হয়েছে। দূরে পাহাড়ের পারে গোলাগুলি আর বোমার আওয়াজ। 'বাঁচাও ফৌজ' নীরব শৃঙ্খলায় কাজ করে চলেছে। দূর গ্রাম থেকে হাজার হাজার নরনারী ও শিশু নিঃশব্দে সন্ধ্যার অন্ধকারে দলে দলে রাজধানীর পথে ছুটেছে। চলো শ্রীনগর—সেখানে শেখ আবদুল্লা। আবদুল্লা বলেন : "ইতিহাসের চক্ষে তারা হবে ঘোর অপরাধী যারা এই হানাদারদের কাশ্মীরের মুক্তিকার বলে আখ্যা দেবে। এরা নারীধর্ষণ করেছে, শিশুকে করেছে হত্যা, সর্বত্র করেছে লুণ্ঠন। পবিত্র কোরাণ হয়েছে এদের হাতে অপমানিত, এরা মসজিদকে করেছে বেশ্যালয়।"

বিলাতের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' : "মধ্যরাত্রের এক নাটকীয় অধিবেশনেই জিন্না রাওলপিণ্ডিতে জেনারেল গ্রেসিকে টেলিফোনে বার্তা পাঠান। ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর অংশগ্রহণের উত্তর দেবার জন্য জিন্না আদেশ

দেন এখনি সৈন্য পাঠিয়ে বরমুলা ও শ্রীনগর দখল করে বানিহাল পার্বত্য পথ রোধ করতে···জেনারেল গ্রেসি বলেন এরকম অবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।" গওবা লিখছেন: "লাহোরের হাইকোর্টে বার্ অ্যাসো-সিয়েশনে সে দিনের (২৭ অক্টোবর) কথা আমার মনে পড়ছে। মুখ চোখের এমন খারাপ অবস্থা আমি কখনো দেখিনি। লাহোরের দাঙ্গায় শাহআলমী গেটে যখন আগুন ধরেছিল এইসব মুখেই তখন দেখেছিলাম পাকিস্তানি গর্বের আভা।"

পণ্ডিতজীর সঙ্গে সফরে বেরিয়ে ডক্টর শ্রীধরণী লিখেছেন: "যখন ঢুকলাম তখন বরমুলা সহর মরে গেছে। দুদিকে লুণ্ঠিত দোকানের সারির মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম জ্বলে যাওয়া পথগুলোতে। ···ঝিলম্ নদীর সেতু পার হতেই······একটি সুন্দরী হিন্দু মেয়ে এল ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তার শোচনীয় কাহিনী জানাতে······আমরা সেন্ট জোসেফস্ কনভেন্টে এলাম······উপাসনা গৃহের জানলাগুলো ভাঙা। লাইব্রেরি লুট হয়ে গেছে··· আর চারদিকে ধ্বংসের উপরে পাঁচটি সন্ন্যাসিনীর ধর্ষণ ও হত্যার যেন আভাস রয়েছে। এক ইংরেজ দম্পতীকেও এখানে হত্যা করা হয়েছিল।"

ঝিলম্ সেতুর উপর দিয়ে লরিতে লুটের মাল ও অপহৃতা নারীদলকে নিয়ে হানাদাররা যখন পার হচ্ছিল তখন অনেক হিন্দু-শিখ-মুসলমান মেয়ে নিচের প্রখর স্রোতে ঝাঁপিয়ে মরে মান বাঁচিয়েছে। যারা পারেনি পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের রাস্তায় মাত্র কয়েক টাকার বিনিময়ে তাদের বেচা-কেনা হয়েছে।

১৬ই মার্চ ১৯৪৮, শেখ আবদুল্লা প্রধান মন্ত্রী হয়েই বলেছেন: "জিন্না বা পাকিস্তানের সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই......প্রত্যেকেই

জানে লোভ, ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িকতার উপরেই পাকিস্তানের ভিত্তি……শেখ আবদুল্লার ঈশ্বর হিন্দুদেরও ভগবান, কিন্তু পাকিস্তানের ভগবান শোষণ...পাকিস্তানে যোগদান করার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।"

হায়দ্রাবাদে শাসনযন্ত্রের মূলে আছেন ইত্তেহাদ উল্-মুসলমিন্। কিন্তু আরব ও রোহিল্লা দলকেও মনে রাখতে হবে। আরব ও রোহিল্লাদের মধ্যে বেশ বিরোধ আছে। বর্তমানে মুস্‌লিম লীগ ন্যাশন্যাল্ গার্ডস্‌এর মতো গড়ে উঠেছে রাজাকর দল। এ-দলের নেতা সৈয়দ কাশিম রাজভি। শীর্ণমূর্তি উপবাসী এই রাজভির মধ্যে রয়েছে মধ্যযুগের তীব্র অন্ধ ঐসলামিক ধর্মোন্মাদ। হায়দ্রাবাদের একেবারে অতি নিকৃষ্ট পশু-শ্রেণীর লোক নিয়েই রাজাকর্ দল গড়ে উঠেছে। আর এদের কার্য-কলাপের মূলে রয়েছে নিজাম গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সম্মতি ও সহযোগিতা। এরাই হল হায়দ্রাবাদী হানাদার যারা ভারতীয় সীমানা অতিক্রম করে দুষ্কর্ম করতে সর্বদাই প্রস্তুত। হায়দ্রাবাদে আন্দোলন অনেকদিন থেকে চলেছে, স্বাধীনতার আগেই—কংগ্রেসী ও কম্যুনিস্ট দলের দ্বারা। হায়দ্রাবাদে সাম্প্রদায়িক সমস্যাও খুব বড়ো নয়, অন্তত জনসাধারণের মধ্যে। অনশনের পরে অধ্যাপক ভাঁসালি সফরে বেরিয়ে মুসলিম জনসাধারণের কাছ থেকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পেয়েছেন। শোনা যায় নিজামের পুত্র, 'বেরারের যুবরাজ', নাকি ভারতে যোগদানের পক্ষপাতী।

আজ রাজভি ও রাজাকরদের কুকীর্তির কথা জানতে কারো বাকি নেই। গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়েছে, নিরীহ নরনারীর উপরে তারা কল্পনাতীত নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি তারা

ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেছে। হিন্দু মন্ত্রী যোশী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পদত্যাগ করেছেন। তারা নির্দোষ গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে, চোখ উপড়ে নিয়েছে, নারীর উপরে দলগত ভাবে করেছে অত্যাচার। রাজভি শাসিয়েছেন : "যদি ভারতীয় ইউনিয়ন হায়দ্রাবাদকে আক্রমণ করে তাহলে তার সৈন্যদল এগিয়ে আসবে হিন্দু প্রজার দেহভস্মের উপর দিয়ে।"

রাজভি আজ জগতের লোকের চোখে। কিন্তু যে লোকের উপর চোখ পড়ে না তিনি হলেন স্বয়ং নিজাম। যারা হায়দ্রাবাদের ভিতরের খবর রাখে তারা জানে রাজভি কেউ নয়, লায়েক আলিও নয়। রাজভি শুধু শিখণ্ডী, আসল লোক নিজাম আর হয়তো তাঁর পিছনে আছে ব্রিটিশ চক্রান্ত আর পাকিস্তানি সহায়তা। ইংরেজ কটনের এরোপ্লেনে অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহের ব্যাপার, গোপন চিঠি থেকে এই ধারণাই দৃঢ় হয়। এমনকি পোর্তুগীজ গোয়াতে নিজামের সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

জুলাই ১৯৪৮, মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় নেহরু বলেছেন :

"আপনারা যাঁরা ইতিহাস জানেন তাঁরা হায়দ্রাবাদের গত ১৫০ বছরের ইতিবৃত্ত স্মরণ করবেন। কোনো রাজ্যের পক্ষেই এ ইতিহাস গৌরবের নয়। এটি গড়ে উঠেছে ভালোবাসায় নয়, সাহস ও বিজয়ের মধ্যে নয়, শুধু প্রতারণায়। যারা রাজাকারদের মতো গুণ্ডাদলের সংঘ গড়েছে, যারা প্রবঞ্চনার মধ্যেই চলে ফেরে, তাদের সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব।"

এই হল হায়দ্রাবাদের ইতিহাস—

হায়দ্রাবাদের রাজপরিবার ইতিহাসের নাম-করা বিশ্বাসঘাতক বংশ।

যুগে যুগে এই বংশ বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তুরাণী দলপতি খওজা আবাদ্ ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের কাছে কাজ আরম্ভ করেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁকে পাঠানো হল দারাকে সাহায্য করবার জন্য; আবাদ যোগ দিলেন আওরংজেবের পক্ষে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে আওরংজেব তাঁকে পাঠালেন যুবরাজ আলমের দলে, কিন্তু খওজা আবাদ আবার চাতুরী খেললেন: ফলে হল এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। যা হোক, পুরানো পদে ফিরে এসে তাঁর মৃত্যু হল গোলকোণ্ডা অবরোধের সময়ে। তাঁরই পৌত্র কামারুদ্দীন (পরে যাঁর আখ্যা হল চিন্‌কুলিচ খাঁ) হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। চিন্‌কুলিচ নিজের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, আওরংজেব বহুকষ্টে এঁকে শান্ত করেন। মৃত্যুর দু'মাস আগে আওরংজেব চিন্‌কুলিচকে (ইনি তখন বিজাপুরের শাসনকর্তা) যুবরাজ কাম্‌বক্সের সহায়ক হতে অনুরোধ করেন। চিন্‌কুলিচ বংশের ধারা অনুসরণ করে বিশ্বাসঘাতক হন এবং যুবরাজ আজমের দলে যোগদান করেন। ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগে তিনি দাক্ষিণাত্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। আজমের পরাজয়ের পর চিন্‌কুলিচ গেলেন বাহাদুর শাহের দলে। কিন্তু বাহাদুরের প্রধান মন্ত্রী মুনম খাঁ এ-ব্যক্তিটিকে ভালো করেই চিনতেন; চিন্‌কুলিচকে পাঠানো হল অযোধ্যার শাসনভার দিয়ে। তিনি সেখানে এসে আবার শুরু করলেন ষড়যন্ত্রের খেলা। বাহাদুর শাহ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে দূর করে দিলেন।

অপমানিত চিন্‌কুলিচ বাহাদুর শাহের ছেলেকে বিদ্রোহী করবার চেষ্টা করলেন। বাহাদুরের মৃত্যুর পর আজিমকে ছেড়ে ইনি এলেন জান্দারের

পক্ষে। এর পর আরো চার পাঁচটি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে আসফ জাহ্ নাম নিয়ে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে চিনকুলিচ হায়দ্রাবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু এখানেই তাঁর কীর্তিকলাপ শেষ হল না, তিনি য়ুরোপীয় জাতিগুলির সঙ্গেও প্রবঞ্চনা ও চক্রান্ত করতে লাগলেন। আসফ জাহ্ অবশ্য শেষে মারা গেলেন, কিন্তু তাঁর বংশধরেরা বংশরীতি বজায় রেখেছেন। দেশের স্বার্থ চিরকাল তারা নষ্ট করেছেন। অনেক দিন আগেই হায়দ্রাবাদ মারাঠাদের হাতে শেষ হয়ে যেত, বেঁচে আছে বৃটিশের আশীর্বাদে। হায়দর আলি ও টিপু স্থলতানের মতো দুটি মুক্তি-যোদ্ধার পরাজয়ের জন্য নিজাম-বংশ দায়ী; এরাই গোপনে ইংরেজকে খবর দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে যোগদানের চুক্তিপত্রে নিজামই প্রথম স্বাক্ষর করেন। রাজ্‌ভির মতো লোক হায়দ্রাবাদের ইতিহাসে নতুন নয়, নিজামের চাতুরীও নয়। চিরকাল গোলামি করেছে এরা ইংরেজের। হায়দ্রাবাদ কখনো যুদ্ধে জেতেনি। একবার যুদ্ধ করেছিল হায়দ্রাবাদ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কোনো এক রাজ্‌ভির প্ররোচনায়। খর্দার কাছে নানা ফার্ণবীশ তাদের শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত করেছিলেন।

এই হল যার ইতিহাস তাকে বিশ্বাস করা বা তার শক্তিকে মূল্য দেওয়া ভারতের উচিত হয়নি। তার সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হয়েছে হায়দ্রাবাদ থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেওয়া। প্রথম থেকেই হায়দ্রাবাদ তার সার্বভৌমতার কথা তুলেছিল, চেয়েছিল বেরারকে তার হস্তগত করতে। আজ অনেকদিন হল বহু অত্যাচারের কাহিনী শোনা যাচ্ছে, একজনের পর একজন আপোষ মীমাংসার জন্য ছুটোছুটি করছেন; কিন্তু

সমস্যার কোনো সমাধান হল না। শুধু সময় যাচ্ছে, আর হায়দ্রাবাদ শক্তি সঞ্চয় করে অপেক্ষা করছে কোনো একটা বিপর্যয়ের সুবিধা নেবার। হায়দ্রাবাদ ভারতে যোগ দিলেও বিশ্বস্ত কখনো হবে না এই নিজামবংশ ও এই ইত্তেহাদ্ দল। হায়দ্রাবাদের চর আজ ভারতের সর্বত্র ঘুরছে আভ্যন্তরীন গণ্ডগোল সৃষ্টি করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত মোল্লার দৌড় মস্‌জিদের মতো আছে ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্ত আর যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ব্যঙ্গ—যুক্ত-জাতি-সংঘ!

কাশ্মীরের শেষ হয়নি, হায়দ্রাবাদের আরম্ভ হয়নি। কিন্তু ইতিহাসের গতি কোন দিকে বোঝা কঠিন নয়। তিনকোনা ভারতের তিনটি কোণেই নজর রাখতে হবে—কাশ্মীরসংলগ্ন পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান আর দক্ষিণ ভারতে হায়দ্রাবাদ। আর অন্তর্বিপ্লবের মাল-মশলার তো অভাব নেই। এর মধ্যে অনেক দোষ থাকলেও একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবেশী হিসাবে খারাপ নয়। তার কারণ এটা বাংলা দেশ, আর কায়েদে আজম্ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর দুই জাতি মতবাদ বাংলা সম্বন্ধে ভালো ভাবে খাটে না।

নিরপেক্ষ বিচারক হিসাবে অ্যামেরিক্যান সাংবাদিক অ্যাণ্ড্রু রথের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। হায়দ্রাবাদ নিজেকে ভারত থেকে আলাদা রাখতে চায়। নিজাম এবং জিন্না দুইজনেরই এই অভিলাষ, কারণ এতে ভারতের বিভাগ আরো সম্ভব হবে। শতকরা প্রায় ৯০জন হিন্দু হলেও শতকরা ৮০ ভাগ কাজ মুসলমানেই পেয়ে থাকে; অথচ নিজাম বলেন যে সাম্প্রদায়িক ভারতে যোগ দিলে তাঁর রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি নষ্ট হবে। হায়দ্রাবাদের অবস্থা মধ্যযুগের যুরোপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষিই এখানে প্রধান জীবিকা। চাষীদের মধ্যে

গভীর অসন্তোষ এবং তাদের বিক্ষোভের ভিত্তিতেই কম্যুনিস্টদের যা কিছু প্রতিপত্তি। অবশ্য শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য নিজাম ৩০ কোটি টাকার এক ব্যাপার ফেঁদে বসেছেন। রামানন্দ তীরথ সফল হতে পারেননি, না হলেও স্টেট্ কংগ্রেস অনেক কাজ করে চলেছে। কিন্তু নিজাম বাইরে থেকে, বিশেষ করে তাঁর বাহিনীর জন্য, বিস্তর মুসলমান এনেছেন। তাঁর বিশ্বাস রাজ্য রক্ষা করতে এরা তাঁকে সাহায্য করবে। কিছুদিন হল ভারতীয় ইউনিয়ন অর্থনৈতিক অবরোধের পন্থা নিয়েছেন। হায়দ্রাবাদ চলেছে যুক্ত-জাতি-সঙ্ঘে।

জুনাগড়: ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে এমন কতকগুলো দেশীয় রাজ্য রয়েছে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও শাসনকর্তা মুসলমান। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার যুগে এটা চোখে লাগে। ভূপাল, ক্যাম্বে, টঙ্ক, রামপুর ও জুনাগড প্রভৃতি এই ধরনের রাজ্য। ভৌগোলিক কারণে এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেও এরা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে বাধ্য। কিন্তু জুনাগড় বাধালো গণ্ডগোল, কাথিয়াওয়ার রাজ্যগুলির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নবাব যোগ দিলেন পাকিস্তানে। প্রধান মন্ত্রী আবদুল কাদিরের অসম্মতি থাকায় তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল। শোনা যায় জুনাগড়ে সিদ্ধান্তের মূলে ছিল বেগমদের প্রভাব আর সিন্ধী মুসলমানদের চক্রান্ত। অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী ভাট্টো এর জন্য বিশেষ করে দায়ী, কারণ নবাবের নিজস্ব মতামত বলতে কিছুই ছিল না।

নবনগরের জাম সাহেব বলছেন, অনেকদিন আগেই তাঁর কাছে একটি গোপন ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা এসেছিল। অবশ্য প্রথমে তিনি এটাকে

অবিশ্বাস্য বলেই মনে করেছিলেন। জুনাগড়ের অবস্থানের ভৌগোলিক মূল্য অসামান্য : এমন একটি জায়গায় পাকিস্তানী ঘাঁটি খুলতে পারলে ভারতকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করবার যথেষ্ট সুবিধা হয়। জামসাহেব বলছেন : "সিন্ধী মুসলমান গোষ্ঠীর হাতেই এখনও সমস্ত ক্ষমতা, নবাবকে বন্দী বললেই ভালো হয়, এবং এরাই জুনাগড়ের সিদ্ধান্ত স্থির করেছে। আমি নিজেই নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেখা হয়নি।"

কিন্তু জনসাধারণ স্থির হয়ে বসে রইল না। শ্যামলদাস গান্ধীর নেতৃত্বে এক শাসনযন্ত্র জুনাগড়ে প্রবেশ করে বারোটি গ্রাম দখল করে বসল। নবাব তাঁর পরিবারবর্গ সঙ্গে নিয়ে করাচীতে পলায়ন করলেন। ১লা নভেম্বর জুনাগড়ে প্রবেশ করল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী শাসনভার গ্রহণের জন্য। ১০ই নভেম্বর মেজর হার্ভে জোন্‌স্ খবর নিয়ে এলেন যে নবাব রাজি হয়েছেন ইউনিয়নে যোগ দিতে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে জুনাগড় এল। জুনাগড়ের জনমত ভারতে যোগদানের স্বপক্ষেই গৃহীত হয়েছে, কিন্তু এখনও জুনাগড় সমস্যা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যুক্ত-জাতি-সংঘেও পাকিস্তানি প্রতিনিধি এই সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়। কাশ্মীরই এদেরমধ্যে সব চেয়ে জটিল পরিস্থিতি।' শেখ আবদুল্লা এ কথা ভালো করেই বোঝেন। তাই যুক্ত-জাতি-সংঘের প্রতিনিধিদের কাছে ঈদ্-দিবসে তিনি বলেছেন : "কাশ্মীর হয়েছে আজ সারা পৃথিবীর সমস্যা।" কিন্তু হায়দ্রাবাদ ভারতের নিজস্ব ব্যাপার ; অবশ্য এখানেও বিদেশী প্রভুরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে ছাড়বেন না, ছাড়ছেনও না। হায়দ্রাবাদের দম্ভ ও সাহসের

মূল কারণ এইখানে। অগস্ট মাসের প্রথমেই হায়দ্রাবাদ সমস্যা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। আর যে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার ভারতের বর্তমান অবস্থা। এখন পৃথিবীতে কারো সন্দেহ নেই যে পাকিস্তান কাশ্মীরে যুদ্ধ চালিয়েছে, পাকিস্তানও একথা এখন স্বীকার করেছে। এ যুদ্ধের আকার ধীরে ধীরে এখন বড়ো হয়ে উঠছে। শুধু হানাদার ও কিছু সাহায্য দিয়ে কাশ্মীর দখল করা গেল না, তাই এখন সামনা-সামনি পাকিস্তান-বাহিনী যুদ্ধে নেমেছে। ৮ই অগস্টের খবরে প্রকাশ যে যুক্ত-জাতি-সংঘের প্রতিনিধিরা যুদ্ধ-বিরতির অনুবোধ করতে পারেন—অর্থাৎ প্যালেষ্টাইনের অবস্থা। হায়দ্রাবাদ তাই সুযোগের অপেক্ষা করছে, অত্যাচারও বাড়িয়ে চলেছে। স্থানে স্থানে ভারতীয় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষও হচ্ছে। ভারতীয় সীমানায় ঘেরা হায়দ্রাবাদকে অর্থনৈতিক ভাবে অবরুদ্ধ করে উপবাসী রাখা ও অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা কিছুই হয়তো শক্ত নয়। আক্রমণ করাও চলতে পারে কিন্তু হায়দ্রাবাদের হিন্দু প্রজাদের সর্বনাশ ও সেই সঙ্গে ভাবতে ও পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গার সম্ভাবনা। এই সমস্যাই হায়দ্রাবাদের সুবিধা।

কাশ্মীরের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল গণ্ডগোল চুকে গেলে জনমত ঠিক করবে কাশ্মীর যাবে কোনদিকে—ভারতে না পাকিস্তানে? হায়দ্রাবাদের সঙ্গে এক বছরের জন্য যে চুক্তি হয়েছিল তাতে উদারতার অভাব ছিল না, এবং সে-উদারতার সুযোগও হায়দ্রাবাদ যথেষ্ট নিয়েছে। এই চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হতে এখনো দেরি আছে, কিন্তু হাজার রকমে এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম বছরে

ভারতের একটি প্রধান সমস্যা—হায়দ্রাবাদ-কাশ্মীর। রাজনৈতিক অর্থে এই দুটি রাজ্যের জটিলতা অখণ্ড। নেহরু তাই বলেছেন এ দুটিকে আলাদা করে দেখলে চলবে না।

রাজাকর্ দল গঠন ছাড়াও হায়দ্রাবাদে সামরিক ব্যবস্থা পূরো দমে চলেছে। সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়েও নিজাম শক্তিশালী। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলেছে। রাজভি ও অন্যান্য নেতারা বার বার বলেছেন যে হিন্দুপ্রধান গণতন্ত্র হায়দ্রাবাদে গঠন কিছুতেই করতে দেওয়া হবে না।

হায়দ্রাবাদের ভিতরের খবর কয়েকটা জানা দরকার। এখানে আরব-দল বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই হায়দ্রাবাদে বর্বর আরবরা সৈন্য হিসাবে আসতে আরম্ভ করে। দাক্ষিণাত্যে এই আরব প্রভুত্ব অভূতপূর্ব, কারণ এক সিন্ধু ছাড়া উত্তর ভারতের কোথাও এদের অস্তিত্ব নেই। এই আরবেরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্দান্ত এবং দুশ্চরিত্র। এদের সঙ্গে কোনো সম্প্রদায়ের সদ্ভাব নেই: এদের দম্ভ, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা অসহ্য। শাসনকর্তারাও এদের বিলক্ষণ ভয় করেন। এই অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রভুত্ব হায়দ্রাবাদের একটি প্রধান আভ্যন্তরীন সমস্যা। এদের মধ্যে অনেকেই বেশ বিত্তশালী এবং এদের সংঘ জামিয়াৎ-উল্-আরব ইত্তেহাদ দলের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। নিজামের আরববাহিনীর নাম 'নাজ্মে জামিয়াতে বে কায়দা'। এরা আসল সেনাদলের অন্তর্গত নয়। এদের নির্যাতনে ও অর্থপৈশাচিকতায় দেশবাসী সব সময়েই সন্ত্রস্ত। কিন্তু এদের শত্রু রোহিলা পাঠান। ১৮৪০ খৃস্টাব্দের দাঙ্গায় অনেক রোহিলা মরেছিল আরবদের হাতে। রোহিলারা এসেছে উনিশ

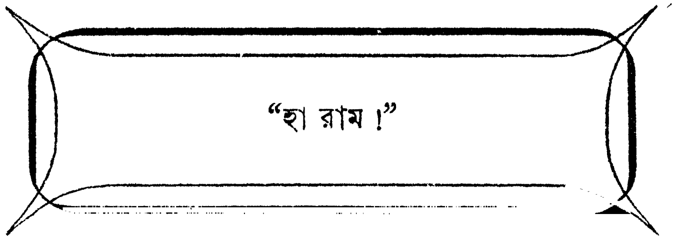
শতকে খাইবার উপত্যকা থেকে। আরবদের মতো নৃশংস না হলেও এরাও বিপজ্জনক একাধিক কারণে। রোহিলা ও আরব সংঘর্ষের মধ্যে আছে হায়দ্রাবাদের দুর্বলতা, যদিও বর্তমানে হয়তো তার সম্ভাবনা কম।

অধ্যাপক ভাঁসালি সফরে বেরিয়ে দেখে এসেছেন কী ব্যাপক ভাবে হায়দ্রাবাদে রাজাকরদের ধ্বংসলীলা চলেছে। আবার উপবাসের মধ্য দিয়ে তাদের বিবেকবুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা তিনি করেছেন। কিন্তু হায়দ্রাবাদের মরণাস্ত্র তার প্রজাদেরই হাতে। নির্যাতিত প্রজারা বিদ্রোহ শুরু করেছে, গ্রামের পর গ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। জনমতের বিরুদ্ধে কোনো রাজশক্তিই শেষ পর্যন্ত টেকে না।

১৭২৭ : ১৩ই সেপ্টেম্বর শোলাপুরের পথে পেশোয়া প্রথম বালাজী বাজিরাও নিজামের ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য অভিযান আরম্ভ করেন।

২২১ বছর পরে আর এক ১৩ই সেপ্টেম্বরের ভোরে হায়দ্রাবাদ অভিযান আরম্ভ হয়েছে। উপায় ছিল না, আরো আগেই কাজ শুরু হলে ভালো হত। অভিযানের ফল যাই হোক, বর্তমানে জটিলতা বাড়বেই।

কূটনৈতিক দাবার ছকে নির্মম নিপুণ খেলা চলেছে। হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর এই খেলার দুটি চাল। আর জিন্নার মৃত্যু এই খেলার প্রথম সংকট।



অন্নদাশঙ্কর কোথায় যেন লিখেছেন এবার ইতিহাসে গান্ধীযুগ আরম্ভ হল। হয়তো সে-কথা ঠিক, হয়তো যিশুকে প্রতারণা করেই জুডাস করেছে তাঁকে অমর। হয়তো গান্ধীজীর হত্যাকারী তাঁকে মৃত্যুদান করে হল তাঁরই যুগ-প্রবর্তক। ইতিহাসের সত্য, ইতিহাসের উপহাস!

গান্ধীযুগ আরম্ভ হল কি-না জানি না, কিন্তু এ-কথা বুঝি যে বর্তমান যুগের তথাকথিত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তর গান্ধীজী। যে স্বার্থ-বিরোধ ও বস্তুতান্ত্রিকতা বর্তমান যুগের পরিচয় গান্ধীজী তার সবচেয়ে বড়ো শত্রু; তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে আছে মধ্যযুগের প্রভাব। তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা আত্মার সাধনা ও মানবতার সেবা। তিনি বিপ্লবী কিন্তু তিনি নিয়ে যেতে চান বিংশ শতাব্দীর জগৎকে মধ্যযুগের মূল্যবোধে।

বিক্ষুব্ধ জনতার মতো গান্ধীজীর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে যেমন আকস্মিক তেমনই বিস্ময়কর। তাঁর প্রভাবের মূলে ব্যক্তিত্ব ও যুগধর্মের অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর অহিংসা-দর্শন রাজনীতিকে করেছে রহস্যময়। তাঁর কার্য-পদ্ধতিও অনেক সময়েই একটি বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন, কারণ তাঁর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে আত্মার আবেগ।

এটা সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্যাপার। বহু দেবদেবীর দেশ এই ভারত; গান্ধীজীও দেবত্বের পর্যায়ে উঠেছেন। ভারতে গান্ধীজীর প্রভাবের মূল কারণ শুধু তাঁর ত্যাগ, তাঁর বুদ্ধি বা আন্তরিকতা নয়; তিনিই ভারতে এক মাত্র ব্যক্তি যাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ভারতের সনাতন অপরিবর্তনীয় চরিত্র ও আত্মা।

হয়তো গান্ধীজীর এই মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। যে হিংসার বিরুদ্ধে সারা জীবন এবং বিশেষ করে শেষ দিনগুলিতে তিনি অশ্রান্ত অভিযান চালিয়েছিলেন, হয়তো তাঁর হত্যা সেই হিংসার শেষ নিরুপায় ক্ষিপ্ত প্রতিশোধ। গান্ধীজীর জীবনের মতো তাঁর মৃত্যুরও সাংকেতিক মূল্য অসামান্য। তাঁব শাস্ত্রীয় কামনা পূর্ণ হয়নি: একশো পঁচিশ বছর তিনি বাঁচেননি। কিন্তু ১৮৬৯এর ২রা অক্টোবর যে জীবন পৃথিবীর অজ্ঞাতসারে আরম্ভ হয়েছিল, ১৯৪৮এর ৩০শে জানুয়ারি তাকে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি, নিষ্ঠুর কিন্তু নাটকীয় সমাপ্তি। তাঁর জন্মক্ষণে কোনো তারকা জ্ঞানী ব্যক্তিদের আহ্বান করে আনেনি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীর সব শ্রেণীর লোক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হয়তো জড় সভ্যতায় ধীরে ধীরে চেতনার সঞ্চার হচ্ছে। চার্চিলের 'অর্ধ-নগ্ন ফকির', কায়েদে আজমের 'হিন্দু নেতা' জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অক্ষয় সম্পদ হয়ে গেছেন।

১৯৪৭এর ১৫ই অগষ্ট গান্ধীজীকে বড়ো আনন্দ দিয়েছিল—বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ১লা সেপ্টেম্বর আনল নিদারুণ আঘাত। কিন্তু উন্মত্ত কলকাতা হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়েছিল। গান্ধীজীর উপবাসের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা বাংলা নিয়েছিল তা ভাঙেনি। বাঙালী যেন এ-কথা ভোলে না যে বর্তমান পৃথিবীর

একমাত্র মহামানব তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন একমাত্র বাংলার কাছে। নোয়াখালি, বেলেঘাটা, দিল্লি। নোয়াখালিতে যা হয়নি, বেলেঘাটায় যা হয়নি, তাই হল দিল্লিতে। রক্তের পাপ থেকে বাংলা মুক্তি পেয়েছে। যিশুকে হত্যা করে ইহুদিরা যাযাবর হয়ে গিয়েছিল; গান্ধীজীর আশীর্বাদে এ-সর্বনাশ থেকে ভারত নিশ্চয় বাঁচবে।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮: গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় হঠাৎ বোমা ফাটল। কিছুদিন থেকেই দিল্লির আবহাওয়ায় অস্বস্তি ও অসন্তোষ এসে গিয়েছিল, তার লক্ষণ কয়েকদিন থেকেই প্রার্থনা-সভায় দেখা গিয়েছিল। পাকিস্তানের অত্যাচারিত গৃহহারা হিন্দু-শিখদের বীভৎস অভিজ্ঞতার কাহিনীতে উত্তেজিত সাম্প্রদায়িকতার চক্রান্ত বেড়ে উঠছিল। দিল্লির দাঙ্গায় গান্ধীজীর শান্তিবাণী অনেকেরই কাছে নপুংসক কাপুরুষতা বলে মনে হয়েছিল। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক লিপিও বহু স্থানে বিলি করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে হিন্দুরাজের কল্পনায় অনেকেরই মনে বিষের আগুন জ্বলল। পুলিশের কড়া ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু গান্ধীজী নিজে এই রক্ষার ব্যবস্থায় বিরক্ত হতেন। ২০শে তারিখের পর নজর আরো কড়া হল, কিন্তু প্রার্থনাসভায় যারা আসত তাদের দেহ-তল্লাশিতে গান্ধীজী আপত্তি করলেন। সর্দার প্যাটেল বলেন বোমা-ঘটনার পর বিরলা-ভবনের প্রত্যেকটি ঘরে একজন পুলিশ অফিসার ছিল।

কয়েকদিন আগে থেকেই গান্ধীজী যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা কিছু ঘটবে। তাঁর অনশনের পরেই পাকিস্তান পেল ৫৫ কোটি টাকা। গওবা লিখছেন: "পাকিস্তানে গুজরাট-হত্যার পর ভারতে তার প্রতিফল

হত ভীষণ যদি মহাত্মা উপবাস না করতেন……পাঁচ দিনের মধ্যেই তিনি পাকিস্তানের শূন্য রাজকোষের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ৫৫ কোটি টাকা আদায় করলেন……আর তারই জন্য মহাত্মাকে প্রাণ দিতে হল।……এই ত্যাগের জন্য 'হিন্দু-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতা'র মৃত্যুতে জিন্না দুঃখপ্রকাশ করলেন……কিন্তু লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ মুসলমান ভারতে ও পাকিস্তানে কেঁদেছিল প্রেম ও ক্ষমার মহত্তম অবতারের মৃত্যুতে।"

শেষের কয়েকদিন আভা ও মানু গান্ধীর কাছে মহাত্মা অনেক বার মৃত্যু ও অসম্পূর্ণ ব্রত, জীবনের অনিশ্চয়তার কথা বলেছিলেন। প্যাটেল বলেন: গান্ধীজী বলেছিলেন যদি কেউ তাঁকে হত্যা করতে চায়, প্রার্থনাসভাতেই করুক; ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮, বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে। প্রার্থনাসভায় রোজকার মতো আজও ভিড়। দর্শনপ্রার্থী জনতা একটু বিস্মিত, একটু অস্থির। 'বাপুজী তো দেরি করেন না! আজ কেন দেরি হচ্ছে? তিনি কি আজ আসবেন না?' ভিড়ের মধ্যে শুধু একটি লোকের বুকে তোলপাড় চলেছে: পকেটে হাত পুরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে, বুকে তার নিরাশা ও প্রতীক্ষার চাঞ্চল্য। 'না, বাপুজী, নিশ্চয় আসবেন।' শুকনো গলায় ঢোক গিলে লোকটি এক পা এগিয়ে এল। ভিড়ের মধ্যে তার উপর কারো নজর পড়ল না, সকলেই বিরলা-ভবনের দিকে তাকিয়ে আছে—যেখানে আছেন বাপুজী। সে মারাঠী। ভিড়ের মধ্যে সে মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে চলল—সে আর এখন মানুষ নয়, অলক্ষ্য অদৃষ্টের অন্ধ অস্ত্র। ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলে উঠল: 'এবার বোধহয় বাপুজী আসছেন—পাঁচটা বেজে পাঁচ

মিনিট হয়ে গেছে।' সে গোঁড়া হিন্দু, সে হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক, হিন্দুধর্ম তার রাজনীতি। জনতা এবার চীৎকার করে উঠল: "বাপুজী, বাপুজী!" মহাত্মা আসছেন মাঠের উপর দিয়ে আভা ও মানু গান্ধীর কাঁধে হাত রেখে। মুখে হাসি, কপালে প্রতি-নমস্কার। লোকটি এখন ভিড় ঠেলে খোলা জায়গায় এগিয়ে আসছে: চোখে তার হিন্দুরাজের দুর্বার স্বপ্ন! একটু হেসে সে বলল: 'গান্ধীজী, আজ আপনার দেরি হয়ে গেছে।' নতজানু হল সে গান্ধীজীর চলার পথে। মানু গান্ধী তাকে বাধা দিতে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়েই হাত তুলে গুলি ছুঁড়ল।

কোথা থেকে কী যেন হয়ে গেল! দিশাহারা জনতা কী একটা অজানা ভয়ে স্তম্ভিত। আবার গুলির আওয়াজ। করজোড়ে ঘাতকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহাত্মা; মুখে মৃদু স্বরে উচ্চারিত হচ্ছে: "হা রাম! হা রাম!" রক্ত ঝরছে পেট থেকে। আভা ও মানু আকুল হয়ে কেঁদে ফেলেছে। আবার গুলি: এবার বুকে। রক্তে শরীর ভেসে গেল: মহাত্মা কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। চোখ থেকে চশমা খসে গেল; পায়ের চপ্পল্ কোথায় ছিটকে গেছে। তখনো জ্ঞান আছে। "বাপুজি! বাপুজি!" আভা ও মানু এই বড়ো প্রিয় দেহটিকে জড়িয়ে পাগলের মতো কেঁদে উঠল। একদল লোক ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে; তাদের পায়ের শব্দে ও চীৎকারে, গুলির আওয়াজে চারদিক থেকে পুলিশের দল ছুটে এল।

ভিড়ের ভিতর থেকে কয়েকজন লোক লাফ দিয়ে এসে লোকটাকে ধরেছে। উন্মাদের মতো প্রহার শুরু করেছে। কপালে তার রক্ত, মুখে নিষ্ঠুর উন্মাদের হাসি। পুলিশ এসে তাকে টেনে নিয়ে গেল। তাকে অনেকেই দেখেছে মহাত্মার সামনে এসে দাঁড়াতে। রিভলভার

থেকে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পুলিসের দলে সে এগিয়ে চলল। তার নাম নাথুরাম বিনায়ক গডসে।

গান্ধীজীকে বিরলা-ভবনে নিয়ে আসা হল। ডাক্তার আসছে। যে মহাত্মার মৃত্যু এনেছে তার উপর কোনো রাগ নেই, মুখে যন্ত্রণার রেখা নেই, ক্ষমাকরুণ দৃষ্টি। জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে। হয়তো, হয়তো বাঁচবেন! মহাত্মার কি মৃত্যু হতে পারে? কতো উপবাসের মধ্যে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও তিনি ফিরে এসেছেন আমাদের কাছে, তাঁকে কি গুলিতে মারতে পারে? দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা হল। এখন আর জ্ঞান নেই। ডাক্তার এসেছেন গান্ধীজীর নিজের ঘরে। পৃথিবীতে এমন গুরুদায়িত্ব কি কখনো কারো উপর পড়েছে? সারা ভারতবর্ষের লোক যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, বলছে: 'বাঁচাও বাপুজিকে।' প্রাণ দেওয়া যেন তাঁরই হাতে!

বিরলা-ভবনের সামনে জনতা বাড়ছে, বন্যার মতো লোক ছুটেছে রাস্তা দিয়ে। 'বাপুজিকে কে মারল? বাপুজিকে বাঁচাও।'

প্রাণশক্তি নিভে আসছে। ঘরের মধ্যে গভীর স্তব্ধতা, শুধু গীতার প্রিয় শ্লোকগুলির উচ্চারণের শব্দ। নীরবতার মধ্যেই শেষ চেষ্টা চলেছে বাঁচাবার।

বাইরে বিরাট জনতা আকুল উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠেছে। মৃদুস্বরে নানারকম গুজব চলেছে। নেতারা একে একে ছুটে আসছেন।

না, আর চেষ্টা করে লাভ নেই। কিন্তু বাপুজি যে একশো পঁচিশ বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন? ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। স্তোত্র পাঠ শেষ হয়ে গেছে।

ব্যাকুল জনতার সামনে দেওয়ান চমনলাল পাঁচটা-চল্লিশ মিনিটের সময়ে বেরিয়ে এসে বললেন : "বাপুজি আর নেই!"

বাপুজি নেই? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? গান্ধীজী তো একটি ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি যে ছিলেন আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ। কখন কী ভাবে ভারতের বর্তমান যুগজীবন তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাতো জানতে পারিনি। আলো-হাওয়ার মতোই নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁকে গ্রহণ করেছি। মানুষ মরে একথা সকলেই জানে। কিন্তু গান্ধীজী? বিশ্বাস হয় না। ভারতে ও পাকিস্তানে সর্বত্র লোক এই কথাই বলেছে : "গান্ধীজী নেই? তা কি হয়!" কিন্তু বেতারে খবর এসেছে। সারা ভারতে অন্ধকার নামল : দলে দলে লোক রাস্তা দিয়ে চলেছে, মনে সকলের এক চিন্তা। এ কী সর্বনাশ হল! স্বাধীনতা আনল মৃত্যু? প্রত্যেকে মনে করেছে আজ রাতে একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে। কালকের সূর্য উঠবে কোন অজানা প্রলয়ের মাঝে?

মজঃফরপুর : মহম্মদ ইসমাইল মহাত্মার মৃত্যুসংবাদে মারা গেল। বোম্বাই : অ্যাপোলো বন্দরে আত্মহত্যা করতে গেল একজন। মীরাট : ধর্মবীর খবর পেয়েই মারা গেল। ভিজিয়ানাগ্রাম : অধ্যক্ষ সুব্রমনিয়ম্ মারা গেলেন। বারাণসী : এক অন্ধ ভিক্ষুক অনাহারে আছে, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে। কটক : শ্রীমতী সন্নায়া মারা গেছেন।

দিল্লির অবস্থা বর্ণনাতীত।

কলকাতার পথে অন্ধকারে জনস্রোত চলেছে। কাজ-কর্ম দোকান-পাট আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে। মৃত্যুর নিঃশব্দতার মধ্যে শুধু বেতারে মহাত্মার মৃত্যু-সংবাদ আর নেতাদের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের বাণী।

লণ্ডনে দুপুরে আহারের ছুটি। এমন সময়ে স্টক্ মার্কেটের কাজ

বন্ধ হয়ে গেল। খবরের কাগজ ফুরিয়ে গেছে। কাগজের স্টলে খবর এঁটে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালে খড়িতে লেখা। আন্তর্জাতিক ভাষাপরিষদ্ ভবনে ষোলটি জাতির পতাকা তর্‌তর্ করে নেমে গেল।

সহরের কাছেই নির্জন বাড়ির বাইরে তুষারপাত চলেছে। আমেরিকার বিখ্যাত লেখিকা পার্ল বাক্ শুনলেন মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দশ বছরের ছেলে ছলছল চোখে বলল: "কেউ কোনো দিন বন্দুক তৈরি করতে না শিখলে ভালো হত।" ভারতবর্ষ ও ভারতের গান্ধী আজ সারা পৃথিবীর কাছে একটা মহৎ আদর্শবাদের সম্পদ—এই কথাই বলেছেন পার্ল বাক্।

বিরলা-ভবনে ঘুমিয়ে আছেন মহাত্মা: মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীর শুভ্র বিশুদ্ধ খদ্দরে ঢাকা।

মোহগ্রস্তের মতো পণ্ডিত নেহরু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গান্ধীজীর পুত্র ও পৌত্রী এবং আশ্রম সেবকরা অশ্রুসিক্ত নয়নে গান গাইছেন। মুসলমান উপাসক আবৃত্তি করলেন: "তুমি শহীদ! যার কেউ নেই তুমি তার সখা!" বাইরের জনতা মহাত্মাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। বারান্দায় এনে মৃতদেহ তাদের দেখানো হল।

বেতারে ভেসে এল নেহরুর ক্লান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বর: "আলো নিভে গেছে আমাদের জীবন থেকে, চারদিকে শুধু অন্ধকার।......এক উন্মাদের হাতে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেছে।"

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, প্রয়াগে চিতাভস্ম বিসর্জনের পর নেহরু বলেছিলেন: "......কিন্তু এই শোকের সঙ্গেও মিশে আছে আমাদের গর্ব যে মহাত্মার মতো নেতাকে আমরা পেয়েছিলাম।"

সারা রাত ঘৃতদীপ জ্বেলে মৃতদেহ ঘিরে সকলে জেগে রইলেন।

সকালে ঘর ফুলে ভরে উঠল। পৌনে বারোটায় শবযাত্রা শুরু হল। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে এসেছেন—বাহুতে তাঁদের শোক-চিহ্নের কালো রেখা। জনতায় দিল্লি সহর ভেঙে পড়েছে। মাঝে মাঝে শুধু চীৎকার: "মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়!" তারপর গভীর শোকের স্তব্ধতা। বিমান থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। রাজঘাটে চিতা সাজানো হয়েছে। সূর্যাস্তের আভায় আকাশ লাল: আগুন জ্বলেছে। মহাচিতায় শুয়ে মহাত্মা অমর হলেন।

পণ্ডিত নেহরু অস্থির হয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সর্দার প্যাটেল্ পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে চিতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন: সন্ধ্যার অন্ধকারে দেহ ভস্ম হয়ে গেল। "আলো নিভে গেছে।"

৭ : বিশ্বের অঙ্গনে

স্বাধীনতা আনল ভারতকে বিশ্বের অঙ্গনে। যুক্ত-জাতি-সংঘে তার স্থান হল। কিন্তু এটা খুব বড়ো কথা নয়। সসম্মানে জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বেঁচে থেকে সপ্তম প্রতিজ্ঞা সূত্রটি পালন করা অনেক বেশি কঠিন।

বিশ্বের দরবারে ভারতের বর্তমান চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির পরিচয় করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী। রাজনীতিক্ষেত্রে এবার নতুন জীবন শুরু হল।

ব্রিটিশ অবশেষে ভারত ছাড়ল। এমন কি বেভার্লি নিকল্‌স্‌ও বুঝেছিলেন যে এ কাজ একদিন করতেই হবে। শুধু বোঝেননি চার্চিল। এখনও তাঁর তারস্বর মাঝে মাঝে শোনা যায়। মার্লবরো-র এই 'নীল-রক্ত' বংশধর রাজার প্রধান মন্ত্রী হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙনে সভাপতিত্ব করতে অস্বীকার করেছিলেন। আজ তাই চাপা শোক তাঁর মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। ১৯৪৭এর অক্টোবর মাসে চার্চিল ভারত-পাকিস্তান দাঙ্গার সম্বন্ধে বললেন : 'যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলেছে তাতে আমি বিস্মিত হইনি। যে দুটি জাতি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির ক্ষমতা রাখে, যারা বহুদিন ধরে উদার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অপক্ষপাত শাসনে শান্তিতে বাস করছিল তারা আজ নরভুক্‌ বর্বরের মতো আচরণ করছে। ভবিষ্যতে

লোকসংখ্যা আরো অনেক কমবে······এবং এই বৃহৎ দেশে সভ্যতার বিনাশে এসিয়ায় এক অভূতপূর্ব সর্বনাশের সৃষ্টি হবে।"

গান্ধিজী তাঁর প্রার্থনা সভায় উত্তর দিলেন: "যদি সত্যই তিনি জানতেন যে ভারত ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্তি পেলে তার এই দুর্দশা হবে তাহলে একবারও কি তিনি ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন যে দোষ কার —যাঁরা এই সাম্রাজ্য নির্মাণ করেছিলেন, না এই দুটি জাতির?" চার্চিল এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে অস্বীকার করেছিলেন।

১৯৪৮এর জুলাই মাসে আবার চার্চিল্ অধীর হয়ে উঠলেন:

"প্রায় ৫ লক্ষ লোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিদায়ের সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছে।······আমরা দেখেছি নেহরুর হিন্দু গভর্ণমেন্টের কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ভীষণ অনাচার······হয়তো আমরা যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখে এসেছি তাই নিয়ে এই গভর্ণমেন্ট প্রাচীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যকেও আক্রমণ করবে।"

চার্চিলের ভারতবিরোধী কীর্তিকলাপের আলোচনা করে প্যাটেল্ বলেন: "চার্চিলকে এখনো তাঁর হিন্দু-আতঙ্ক রোগ ছাড়ে নি।······ ভারতের সর্বনাশা দাঙ্গার জন্য চার্চিল্ ও তাঁর অনুচরদেরই ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।" প্যাটেলের তিরস্কারেও এঁর লজ্জা বা চৈতন্য হয়নি। পার্লামেণ্টে বিতর্ক আহ্বান করে তিনি প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলির কাছ থেকেও অপ্রিয় কথা শুনেছেন।

মাউণ্টব্যাটেনের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন ভারতের নাবালকত্ব শেষ হল। যাবার সময়ে তিনি বললেন: "এই ঐতিহাসিক মাসগুলোয় ভারতে থাকা আমার ও আমার পরিবারবর্গের কাছে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।···ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।" বিলাতে পদার্পণ

করেই মাউণ্টব্যাটেন্‌ ভারত ও নেহরুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তানের এক প্রতিনিধি বলেছেন যে ভাগাভাগির জন্য অতিরিক্ত তাড়া দিয়েই মাউণ্টব্যাটেন্‌ সর্বনাশ করে গেছেন। এ তাড়া কি জিন্নার ছিল না?

ভারতের অবস্থা বর্তমানে কী? "স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণ তন্ত্রই" কি তার লক্ষ্য? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে কী কোনো সম্পর্ক থাকবে না? ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পার্লামেণ্টে পাশ হয়ে গেছে, কিন্তু তা থেকে লাভ হয়েছে ডোমিনিয়ন মর্যাদা। আইনমন্ত্রী ডক্টর আম্বেদকরের উক্তি থেকে মনে হয় ভারত গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয় ব্রিটিশ জাতি-সংঘ থেকে ছিন্ন হয়ে যাওযা। গণ-পরিষদের অধিবেশনও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভব নেহরু প্রধান মন্ত্রীদের মিলনের অপেক্ষা করছেন। স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা-ভিত্তি বিপন্ন বলে মনে হচ্ছে। শ্রীযুক্ত শরৎ বসু তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন, কাশ্মীর-প্রস্তাব যুক্ত-জাতি-সংঘের দরবারে পাঠিয়ে ভারতের জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য মাউণ্টব্যাটেন্‌ই দায়ী, হায়দ্রাদের সঙ্গে চুক্তির জন্যও ভারতকে দক্ষিণ এসিয়ায় জাতি-সংঘ গড়ে তুলে আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অবশ্যই তার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দরকার।

কূটনীতির জগতে ভারত নতুন আগন্তুক। পৃথিবীর নানাদেশে আমাদের প্রতিনিধিরা যাচ্ছেন—মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ থেকে! নানা দেশের রাজদূত আসছেন আমাদের দরবারে। গৌরবের কথা, চিন্তার কথাও বটে। নেহেরু তাঁর এক বক্তৃতায় দুঃখ করেছেন যে লোকে বলছে তিনি নাকি দেশের দিকে না তাকিয়ে বিদেশ নিয়েই মত্ত আছেন। তিনি আমাদের সাবধান করে বলেছেন যে এই সংকীর্ণতার মধ্যেই বিপদের

সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ, দেখা গেছে যে অতীতে যখনই ভারত বহির্সম্পর্ক থেকে সরে আসতে চেষ্টা করেছে তখনই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। একথা ঠিক। এখন দেখা যাক বহির্জগতে আমরা কেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি।

রাজদূত ও প্রতিনিধিবর্গ বিদেশে গিয়ে কী করছেন সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শর্মা বোম্বাইয়ের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখছেন: "আর্জেণ্টাইন্ ভারতের প্রতি রুষ্ট বলেই মনে হয় এবং এর কারণ হচ্ছে ভারতের কুখ্যাত প্রতিনিধিবর্গের আর্জেণ্টাইনে আগমন।" দিল্লীর 'নিউজ ক্রনিক্‌ল্' পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে: "ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতের (জনাব আসফ্ আলি) বিশেষ ঘনিষ্ঠ এক মুসলিম দম্পতী ভারতীয় এম্‌ব্যাসির সব খবর নিয়ে পাকিস্তান এম্‌ব্যাসিতে গিয়ে ঢোকেন।" আমেরিকায় ভারত-বিরোধী জনমত সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস্ পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সাহায্য করছেন এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

যুক্ত-জাতি-সংঘের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা দুটি বিষয় নিয়ে—দক্ষিণ আফ্রিকা ও কাশ্মীর। দুটিতে বাক্য, সময় এবং অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। কাজে বিশেষ কিছু ফল হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার নিয়ে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী ও কাশ্মীর ব্যাপারে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার চেষ্টার ক্রটি করেননি। কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌স্ ও তাঁর উত্তরাধিকারী গোঁ ছাড়েননি। এদিকে জাফরুল্লা খাঁ দীর্ঘতম বক্তৃতায় কাশ্মীর, জুনাগড়, জাতিলোপ, ভারতের অত্যাচার ইত্যাদি জড়িয়ে জাতি-সংঘকে এমন চিন্তিত করেছেন যে তাঁদের প্রতিনিধিরা কাশ্মীরে তদন্তে ব্যস্ত।

ইংরেজ চলে গেছে। কিন্তু ফরাসী? পোর্তুগীজ? এরা এসেছিল

অনেক আগেই। সতেরো ও আঠারো শতকের ভারতে এদের ব্যবসার সঙ্গে চলেছিল রাজনৈতিক চক্রান্তের খেলা। শেষে কয়েক টুকরো জায়গা রইল পড়ে এদের হাতে। এদেরও আজ যাবার সময় হয়েছে। চন্দননগরের আগেই গোয়ায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তাতে নেহরু ও কংগ্রেসের সহানুভূতি ছিল। কিন্তু আজও পোতুর্গীজ কর্তারা নরম হননি, প্রজা-আন্দোলন থামাবার অত্যাচার চলেছে। শোনা যাচ্ছে পোতুর্গীজ গভর্ণমেণ্ট এমন কি তাঁদের খাস নিগ্রো সৈন্য আনাবার ব্যবস্থা করেছেন; হায়দ্রাবাদের সঙ্গেও নাকি তাঁদের ষড়যন্ত্র। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট অনিচ্ছায় মত দিয়েছেন প্রজাদের ইচ্ছায়। জনমত সিদ্ধান্ত করবে কোথায় তাদের সুখ!

এবার দেখা যাক ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্ক। এরা এখনো দুটি সম্পূর্ণ আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। হাজার রকমের সম্পর্কে এরা জড়িয়ে আছে। কিন্তু কয়েক ব্যাপারে মাঝে মাঝে মৈত্রীর কথা শুনলেও বিদ্বেষ ও বিরোধ বেড়েই চলেছে। এই দ্বন্দ্ব পশ্চিমে যতটা পূর্বে ততটা নয়। একটা কথা: পাকিস্তান থেকে মুসলমান ও অমুসলমান অনেকেই চলে আসছে। অমুলমানদের মধ্যে শুধু হিন্দু-শিখ নয়; ইহুদী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্, ইউরোপীয়ান্ ইত্যাদিও আছে। নিরাপত্তার অভাব, নানারকম অসুবিধা, অর্থনৈতিক কষ্ট—এইগুলোই হচ্ছে চলে আসার কারণ। এভাবে চলে আসায় যেমন পাকিস্তান সম্বন্ধে অনাস্থা তেমনি আবার ভারতেরও সমস্যাবৃদ্ধি—খাদ্য ও জীবিকা প্রধানত।

পাকিস্তান নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন, বিশেষত দারিদ্র্য। ভারত প্রথম থেকেই এমন ভাব দেখিয়েছিল যে পাকিস্তানের মেয়াদ মাত্র কিছু

দিনের। নানাভাবে হয়তো অসুবিধাবও কিছু সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তান নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাদ গণল। তারপর দাঙ্গা আর সমস্যা—সব কিছু গড়ে তোলা, আশ্রয়প্রার্থী, পাঠানিস্তান, উপজাতির উপদ্রব, কাশ্মীরের ভারতে যোগদান। পাকিস্তানের মন বিষিয়ে গেছে—বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তানের যে কিছু হয়নি এমন নয়। হিন্দুদের উপর অর্থনৈতিক চাপ, ত্রিপুরা দখলের চেষ্টা, জায়গায় জায়গায় সীমানায় এসে গণ্ডগোল। শেষের খবর হচ্ছে আসামের পার্বত্য জাতিদের সঙ্গে নাকি গোপন ষড়যন্ত্র চলেছে ভারতেব পূর্ব কোণ বিপন্ন করার জন্য।

সম্পর্কের কয়েকটা উদাহরণ নেওয়া যাক। লিয়াকৎ আলি বার বার জানিয়েছেন যে ভাবত তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ভারতের তো লেগেই আছে। কায়ুম খাঁ এক বেতার বক্তৃতায় প্যাটেলকে বলেন 'যুদ্ধের দালাল'। ১৯৪৮এব মে মাসে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলিম, ডক্টর হামিদ, এক গোপন খবর প্রকাশ করেন যে পশ্চিম পাঞ্জাবে একটি দল গড়ে উঠছে যাদের আদর্শ হচ্ছে ভারত থেকে কতকগুলো প্রদেশ ও এলাকা কেড়ে নেওয়া। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলিমদের কাছে গোপন চিঠি বিলি করা হয়। তাতে লেখা ছিল, "...একটি সভা আহ্বান করা হবে।......আপনি সত্ব করে চাঁদা পাঠিয়ে দিন......হিন্দুস্থানের সাড়ে পাচকোটি মুসলমান নিঃশেষ বা ধর্মান্তরিত হবে।" লাহোর থেকে এসেছিল এই চিঠি। অথচ ভাগ-বাঁটোয়াবার সময়ে প্রায়ই শোনা যায় দুটি রাজ্যের সম্প্রীতির কথা। আর্থিক সম্পর্কের দিক দিয়ে দেখা যায় যে ভারত জনসাধারণের কাছের দেনা নিয়েছে নিজের উপরে। শতকরা সাড়ে সতেরো ভাগ দেনা পাকিস্তান নিয়েছে

এবং ভারতের কাছে তার শোধ হবে ৫০ বছরে। ৭৫ কোটি নগদ টাকা পাকিস্তানকে দেওয়া হয়ে গেছে।

বিদেশী সম্পর্ক যেমন প্রয়োজনীয় আবার তেমনি বিপজ্জনক। এই ক্ষুরধার পথে এতোটুকু অসাবধান হবার উপায় নেই, তাহলেই বিপদ। বর্তমান পৃথিবী আন্তর্জাতিক, কিন্তু এই বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিকতা অনেক রকমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জটিলতারও সৃষ্টি করেছে।

৮ : ভারতের ভিতরে

একটা স্বাধীন জাতির পরিচয়ের গোড়াতেই আসে জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এখনো ঠিক স্থির হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'বন্দেমাতরম্' স্বাধীনতা-সংগ্রামে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মনে উদ্দীপনা এনেছে, কংগ্রেস আজ তাতে আস্থা রাখতে পারছেন না। ভাষাটা সংস্কৃত, হয়ত পৌত্তলিকতারও আভাষ আছে ; অহিন্দুর কাছে হয়তো একটু পীড়াদায়ক। অবশ্য সংগ্রামের যুগে একথা কেউ ভাবেনি। তা ছাড়া গানের সুর আর গাইবার ভঙ্গীও নাকি ঠিক সুবিধের নয়। ইক্‌বালের 'হিন্দুস্থান হমারা'ও চলতে পারে না নানা কারণে, যদিও সুরের ও ভাষার তেজে একটা উন্মাদনা আসে। অতএব এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন'। কিন্তু এখানে ভারতের চেয়ে ভারতের অধিনায়কত্বের কথাই স্পষ্ট। আর মুশকিল হয়েছে এই যে এখানে পাকিস্তানী সিন্ধুর নাম রয়েছে : এ যে অখণ্ড ভারতের গান! আরো মুশকিল এই যে এ গানে আসামের নাম নেই, আসামীরা তাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'সিন্ধুর' জায়গায় 'আসাম' বসিয়ে একটু সুরের খেলা করে দিলেই তো গণ্ডগোল মেটে! যাই হোক, আমরা স্বাধীন হলেও আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এখনো ঠিক হয়নি। এখন কথা হচ্ছে :

বন্দেমাতরমে জনগণমনের সুর লাগালে কেমন হয়? কষ্টে দেবায়!

অবশ্য জাতীয় পতাকা নিয়ে আমরা সামান্য একটু গণ্ডগোল করেছিলাম, কিন্তু সে গণ্ডগোল মিটেছে। গেরুয়া, শাদা, সবুজ, শাদার উপরে নীল অশোক চক্র; অশোকস্তম্ভকেও আমরা ছাড়িনি, অন্য কাজে লাগিয়েছি। নেহরু ও রাধাকৃষ্ণন্ পতাকার ব্যাখ্যা করে আমাদের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন। গেরুয়ায় আছে ত্যাগের ইঙ্গিত, শাদায় পবিত্রতা, সবুজে প্রাণশক্তি। চক্রের মধ্যে রয়েছে শান্তিপূর্ণ জীবনগতির ছন্দ।

নেহরু বললেন: "যেখানেই এ পতাকা যাক না কেন সেখানেই এটি আনবে স্বাধীনতা ও সখ্যের বার্তা·····যে জাতি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ভারত করবে তাকে সহায়তা।"

এর পর আমাদের শাসননীতির কথা। তার শুধু খসড়া তৈরি হয়েছে; মূল কথা: সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃভাব। খসড়াটি আঠারো অংশে বিভক্ত; তার মধ্যে প্রধানগুলি হচ্ছে: (১) কেন্দ্র ও তার এলাকা এবং নানারকম অধিকার, (২) মৌলিক অধিকার, (৩) নাগরিকতা, (৪) কেন্দ্রাধীন রাষ্ট্র—গভর্নর শাসিত প্রদেশ ও চিফ্ কমিশনার্ শাসিত প্রদেশ, (৫) অন্যান্য এলাকা—দেশীয় রাজ্য ইত্যাদি, (৬) কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক।

এর পর আমাদের প্রদেশগুলির বর্তমান অবস্থা। এখানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছে—যেমন, হিমাচল। আরও কয়েকটি হবে—অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি। এদের সংখ্যা নিরূপণ করা শক্ত। আয়তনের দিক দিয়েও পরিবর্তন হয়েছে নানা কারণে—বিভাগের ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবের চেহারা বদলে অনেক ছোট হয়েছে; কয়েকটি

ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে কয়েকটি প্রদেশকে স্ফীত করেছে—বিহার ও উড়িষ্যা। বাংলার ব্যাপার স্বতন্ত্র : বিভাগের ফলে বাংলা হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল, উত্তর দক্ষিণে তার যোগ নেই, লোকসংখ্যা তার অতিরিক্ত, সম্পদ তার সামান্য। প্রতিবেশী প্রদেশ-গুলির কাছে বাংলা পেয়েছে অকৃতজ্ঞ দুর্ব্যবহার। তাই কংগ্রেসেরই মূলনীতি অনুসরণ করে ভাষার ভিত্তিতে বাংলা ফিরে পেতে চায় তার হারানো এলাকা বিহারের কাছ থেকে। কিন্তু কংগ্রেস ও কংগ্রেস-সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাংলার এ দাবিতে নিরুৎসাহ। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি (যাঁর প্রদেশ থেকে অনেকগুলি প্রদেশের সম্ভাবনা) তিনিও বাংলাকে প্রাদেশিক মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাব দাবি অনস্বীকার্য—বিহা᳚ ও আসামের এলাকায়।

যে প্রাদেশিকতা আজ ভারতেব আভ্যন্তরীন ভাঙনেব সম্ভাবনা এনেছে তা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বর্তমান প্রদেশ-সীমানা সবদিক দিয়েই অর্থহীন। এভাবে পরস্পরকে ধরে রাখলেই অখণ্ডতা রক্ষা হবেনা, তাতে বিদ্বেষই বাড়বে দিন দিন। ভারত বহুজাতি ও বহুভাষাব সমন্বয়, কিন্তু প্রত্যেকটিরই একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। প্রাদেশিকতার আঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলা : যুক্তপ্রদেশে, বিহারে, উড়িষ্যায় ও আসামে তার দুর্দিনে আজ স্থান নেই। অথচ এই বাঙালীই উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত ভারতেব স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী। যে নেতারা আজ বাংলাকে তিরস্কার করেন প্রাদেশিক মনোবৃত্তিব জন্য, তাঁরা ভুলে গেছেন বাংলার অপক্ষপাত সেবা ও অবদান, তাঁরা ভুলে যান তাঁদের প্রদেশের মনোবৃত্তি, তাঁরা দেখেন না যে আজও বাংলায় সারা ভারতের লোক অবাধে নিজেদের প্রতিষ্ঠা রেখেছে। কিছুদিন আগে

কুচবিহারকে আসামের মধ্যবর্তিতায় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরার অবস্থা তো আরো শোচনীয়। পাকিস্তানের সীমানায় পড়ে আসামের উপরেই তাকে নির্ভর করতে হবে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের মধ্যেই বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হবে? তাহলে স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের অর্থ ছিল।

নেহরু তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন :

"আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িকতার ফল। ভারত বিভাগ এবং অবশেষে গান্ধিজীর মৃত্যু হল।······কিন্তু প্রায় সেই রকম ভীষণ বিপদই আজ আমাদের সামনে—প্রাদেশিকতা। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের বিরোধিতা করছে এবং তাদের পরস্পর অবিশ্বাস ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যদি এই অমঙ্গল দমন করতে না পারি আমরা, তাহলে ভারত হবে শুধু নামেই ঐক্যবদ্ধ।"

খুব সত্যি কথা : কিন্তু এর কারণ কী? কংগ্রেসী নেতারা নিজেদের কাছেই এ প্রশ্ন তুলুন : দেশের লোক তো তাঁদেরই হাতে কলের পুতুল।

মনু সুবেদার এক অসম্ভব সমাধান প্রস্তাব করেছেন। তাঁর ইচ্ছা প্রদেশের সীমানা উঠে যাক, তার জায়গায় আসুক সারা ভারতে ৫০ বা ৬০টি বিভাগের প্রত্যেকটিতে ৩ বা ৪টি জেলা। কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার হোন শাসনকর্তা। গণতান্ত্রিক কেন্দ্র হোক শেষ ক্ষমতা। বিভাগের ভাষা হোক জেলার ভাষা। কিন্তু এখানেও তো বিভাগ ও ভাষার বিপত্তি!

ভারত থেকে ব্রিটিশ প্রভুত্ব চলে যাবার পরেই দেশীয় রাজ্যগুলি হল এক মহা সমস্যা। কোচিন ও এই রকম দু-একটি রাজ্য ছাড়া বাকিগুলির রাজা-রাজড়ার মনে রয়েছে মধ্যযুগের সমাজজ্ঞান। গণতন্ত্র এঁদের কাছে

অভাবনীয়। তবু এই অসংখ্য দেশীয় রাজ্যগুলিতে অল্পবিস্তর গণচেতনা হয়েছে, কোথাও কোথাও প্রজা-আন্দোলন চলেছে। সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়ে থাকবার বাসনা অনেকের মনেই হল। কয়েকজন অবশ্য প্রথমেই ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত করলেন, কিন্তু বাকিগুলির প্রধান আশ্রয় হল সময়। "দেখি কী হয়!" এই হল এঁদের নীতি। কিন্তু মুশকিল হল এঁদের ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে। ভারত বা পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে অস্তিত্ব রাখাই যে কঠিন! আবার কোনো কোনো রাজ্যে প্রজারা আবদার ধরে বসল। রাজা-নবাবের দল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রথমেই চেষ্টা হল ভারতের কাছ থেকে যতটা পারা যায় সুবিধা আদায় করে নেওয়া। ভারত গভর্ণমেণ্টও একটু বেশি উদার হয়ে পড়লেন, না হয়েও উপায় ছিল না। চারদিকে গণ্ডগোল, আর হাঙ্গামা বাধলে সামলানো যাবে না। অতএব প্রজাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেও দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতা তাঁরা কামনা করলেন। একে একে ভারতীয় ইউনিয়নে রাজা-রাজড়া এসে জুটতে লাগলেন। পন্থা হল মোটামুটি তিন রকমের—(১) নিজের সীমানা অক্ষুণ্ণ রেখে যোগদান—বরোদা, মহীশূর, কুচবিহার ইত্যাদি। (২) দলবেঁধে যোগদান—সৌরাষ্ট্র, বিন্ধ্য ইত্যাদি। (৩) নিজের অস্তিত্ব না রেখে ভারতীয় ইউনিয়নের সীমানা বৃদ্ধি। এই ভাবে কাজ চালিয়ে এক বছরের মধ্যেই ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রায় সব রাজ্যেরই সঙ্গে রফা করে ফেলেছেন। এটা একটা মস্ত লাভ—সব দিক দিয়েই। ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক জটিলতা অনেক কমেছে। কিন্তু ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত এভাবে শাসনভাগ লোপ করে দেওয়া। তারপর সরল একটা মানচিত্রের উপরে ভাষা, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক অবস্থানের

দিকে নজর রেখে নতুন ভাবে প্রদেশ গঠন ও সৃষ্টি করতে হবে।

ভারতের রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব পূরো মাত্রাতেই চলেছে। ভারত-বিভাগের পরিকল্পনার সময় থেকেই কংগ্রেস-বিরোধী দল বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও এই অন্তর্দ্বন্দ্বে সহায়তা করল। রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক নানা কারণে এই সব দলগুলির উদ্ভব হল। জনমত গঠিত হতে লাগল যে কংগ্রেসী নীতি স্বাধীনতার সঙ্গেই বদলাতে হবে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল, কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধী প্রতিষ্ঠান পরস্পরের অনেকটা কাছে এসে গেল। কংগ্রেসী নেতারা দেখলেন বিশৃঙ্খলার পূর্বাভাস। উৎপাদন কমে গেছে, শ্রমিক অসন্তোষ রয়েছে, চারদিকে হাজার রকমের সমস্যা। কংগ্রেস থেকে সমাজতন্ত্রী দলকে সরিয়ে ফেলা হল। শ্রমিকদের সঙ্গেও একটা রফার চেষ্টা হল। এদিকে সাম্প্রদায়িক কারণে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ একটি বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, হিন্দু মহাসভাও বিরোধিতা করেছে। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ নতুন নয়, তাদেরও দমন করা দরকার। এদিকে নানা জায়গায় গোপন ষড়যন্ত্র (দেশী ও বিদেশী) ধরা পড়ছে, সশস্ত্র ডাকাতিও বেড়ে চলেছে। কংগ্রেস দলে লোকসংখ্যা বাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। বহু বাধা সত্ত্বেও নিরাপত্তা আইন জারি করা হল। ধীরে ধীরে কম্যুনিস্ট ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ইত্যাদির উপরে নিষেধাজ্ঞা এসে গেল। কিন্তু শিখরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে; কংগ্রেস তাই চেষ্টা করলেন আকালী দলকে হাতে আনতে। জায়গায় জায়গায় ক্ষমতার যে অপব্যবহার হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এভাবে যে শক্তির দ্বন্দ্ব আসবে তা তো আগেই জানা ছিল। কংগ্রেস চান অপ্রতিবাদে সর্ব ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে

সহযোগিতা ; সব সময়েই তাঁদের মুখে শোনা যায় সমস্যার জুজুর কথা। দেশের স্বার্থ এবং নিজেদের স্বার্থের জন্যও তাঁরা তাই বারবার শান্তি ও ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর এতো জোর দিয়েছেন। ১৯৪৭এর ডিসেম্বর থেকেই জনসাধারণের মধ্যে একটা ধারণা হচ্ছিল যে কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যেই দলাদলি আরম্ভ হয়েছে। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেই কংগ্রেসের এক অধিবেশনে নেহরু ও প্যাটেল্ এই ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এ ধারণা একেবারে দূর হয়নি। ১৯৪৮এর অগস্টের এক বক্তৃতায় কোনো সমাজতন্ত্রী নেতা কংগ্রেসের কুশাসনের নিন্দা করে বলেন যে নেহরু পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছেন, তাঁর সহকর্মীরাই তাঁকে প্রতারণা করছেন। কংগ্রেসী আমলে ধরপাকড়ও চলেছে খুব।

এদিকে রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে নৈতিক ও আর্থিক অবস্থার কথাও ভাবা যাক। কেন্দ্রে ও প্রদেশে দুর্নীতির একটা মরসুম পড়ে গেছে। চাকরি ও ব্যবসার ব্যাপারে প্রাচুর্যও যেমন নৈতিক অধঃপতনও তেমনি। ঘুষ ও চোরা কারবারের অন্ত নেই। ভারত ও পাকিস্তানের সীমানায় নির্লজ্জ ভাবে নিষিদ্ধ দ্রব্যের চালান হচ্ছে। কংগ্রেসী লোকেরাই এসব নোংরামিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। আর নেতারা এই দুর্নীতি স্বীকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। কিন্তু অর্থের লোভে ও অর্থের ক্ষমতায় অঘটনও ঘটে যাচ্ছে। গান্ধীজী অনেকবার বলেছিলেন নিয়ন্ত্রণ-রীতি তুলে দেবার জন্য ; ধীরে ধীরে লুপ্ত বিবেক ফিরিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু অনিয়ন্ত্রণেও কোনো ফল হল না।

আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে অনেক। দেশের খাদ্যাভাব দূর করতে হবে। জমিদারি প্রথা আমরা উচ্ছেদ করব, গড়ে তুলব বিরাট শিল্প-

প্রতিষ্ঠান। যন্ত্রে ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে সারা দেশের চেহারাই বদলে দেব। জাতীয় বাহিনী ও সামরিক শক্তি গঠন করাও আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে। শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে আমরা পিছিয়ে থাকব না। হয়তো সব ব্যাপারেই কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে।

হীরাকুড্‌ বাঁধে কাজ শুরু হল, দামোদর উপত্যকাতেও তোড়জোড় চলেছে। কলাভবনও রচিত হবে। সমাজসেবা হবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা। প্রদেশে প্রদেশে বেকার সমস্যা দূর করবার চেষ্টা চলেছে, ছাঁটাইও বন্ধ নেই! ডঙ্কা-নিনাদে সামরিক বাহিনীতে আহ্বান করা হয়েছে।

যুদ্ধ? বিপ্লব? শান্তি?

ভাষার সংকট! হিন্দী না হিন্দুস্থানী? না ইংরেজী? কী হবে আমাদের স্বাধীনতার ভাষা?

কর বাড়ছে, মূল্য বাড়ছে, টাকা সস্তা।

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উন্নতি পরিকল্পনা:

উৎপাদনের শক্তি বাড়িয়ে জীবিকার মান উঁচু করো। আয় ও সম্পদের উপযুক্ত বখরায় অসাম্য দূর করো। শিল্প-সম্প্রসারণের সঙ্গে আসবে বৃত্তির অভাবনীয় সুযোগ।

উটকামণ্ডে এসিয়া দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক পরিষদের (ইকেফ্‌) অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু বললেন: "রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা এখনো বিশেষ সাফল্য লাভ করিনি, কিন্তু আমি আশা করি যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য এলে রাজনীতিও তাতে প্রভাবান্বিত হবে।"

নয়া দিল্লিতে খাদ্যমন্ত্রী জয়রামদাস দৌলতরাম আশ্বাস দিয়েছেন:

"আমাদের খোরাকের অবস্থা বিশেষ কিছু খারাপ নয়।" ১৯৪৬-৪৭

এর চেয়ে এ বৎসরে আমরা প্রায় ৯০০,০০০ টন আহার্য দ্রব্য উৎপাদন করেছি। অবশ্য আমদানীর উপরে আমাদের নির্ভর করতে হয়। এখন মনে হচ্ছে ২,০০০,০০০ টন খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব হবে। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি যোগাবে ৫০০,০০০ টন। বিতরণের জন্য মোট থাকবে আমাদের হাতে ৩,৬০০,০০০ টন।

৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত সরকারের শিল্পনীতির পরিচয় দিলেন। শিল্পোন্নতির ব্যাপারে ভারত সরকার ক্রমশ হস্তক্ষেপ করবেন। বর্তমানে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন, অ্যাটমীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং রেলপথ সরকারের নিজের হাতেই থাকবে। যে কোনো শিল্প দেশরক্ষা বা জনস্বার্থের জন্য সরকার গ্রহণ করতে পারেন। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য অনেক কাজ আরম্ভ হয়েছে। যে কয়টি শিল্পের উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে তার মধ্যে কয়েকটি হল: লবণ, বিদ্যুৎ যন্ত্র, ভারি রাসায়নিক, তুলা ও পশম, সিমেণ্ট, খনিজ, কাগজ, চিনি, ইত্যাদি।

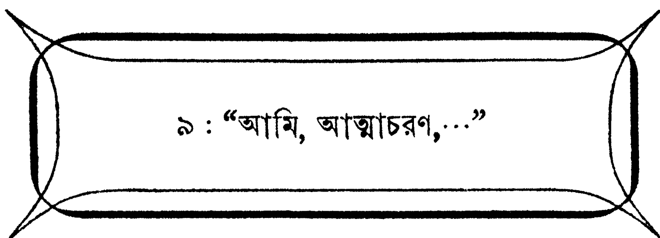
কংগ্রেসী শ্রমনীতি তিন বছরের আপোষ। কিন্তু শ্রম ও পুঁজির মধ্যে এভাবে রফা চলে না। এতে শেষ পর্যন্ত অসন্তোষ দূর হয় না, কিন্তু উৎপাদন ব্যাহত হয়। যান্ত্রিক শিক্ষার অভাবে নৈপুণ্য থাকে না, শ্রমিক সংখ্যাও বেশি পরিমাণে লাগে। এদিকে বেতনও অল্প, বিক্ষোভও বাড়ে। এই বিক্ষোভকে আয়ত্তে আনবার জন্যই ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস খুলেছেন।

ভারতের অর্থনৈতিক প্রসারের পক্ষে প্রধান বিঘ্ন হচ্ছে স্টার্লিং পাওনা। ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতা নেই মাল রপ্তানি করে ভারতের দেনা মেটাবার অথচ ভারতকে সে যথেষ্ট পরিমাণে ডলারও দিতে পারে না।

ফলে ভারতকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য হতে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। একটা চুক্তি হয়েছে যার ফলে চলতি হিসাব ও জমার হিসাব তৈরি করে খানিকটা অসুবিধা দূর হয়েছে।

বাধ্যতামূলক বনিয়াদী শিক্ষা, সামরিক শিক্ষা ইত্যাদি নানা পরিকল্পনা থাকলেও এগুলোকে কার্যে পরিণত করা বর্তমানে সম্ভব নয়। উচ্চ-শিক্ষারও প্রসার এবং উন্নতির চেষ্টা চলেছে। তবে নজর পড়েছে সবার আগে বিজ্ঞান-চর্চার দিকে।

ভারতের ভিতরের অবস্থার দিকে তাকালে বোঝা যায় অনেক দোষ ও বাধা সত্ত্বেও এক বছরের হিসাবে যা হয়েছে তা গোলামির যুগে সম্ভব ছিল না। কিন্তু পুরানো নীতি বদলালে অনেক বেশি উন্নতি হতে পারত।



২২শে জুন ১৯৪৮ : লালকেল্লা : দিল্লি

"আমি, আত্মাচরণ, আই-সি-এস্, বিচারক, বিশেষ আদালত, লালকেল্লা, দিল্লি, এতদ্দ্বারা অভিযুক্ত করছি তোমাদের" :

(১) নাথুরাম বিনায়ক গডসে (৩৭)

(২) নারায়ণ আপ্তে (৩৪)

(৩) বিষ্ণু কর্‌করে (৩৭)

(৪) মদনলাল পা'হোয়া (২০)

(৫) শঙ্কর কিষ্টায়া (২০)

(৬) গোপাল গডসে (২৭)

(৭) বিনায়ক দামোদর সাভারকর্ (৬৫)

(৮) দত্তাত্রেয় পারাচুরে (৪৯)

দিগম্বর ব্যাজকে ক্ষমা করে হয়েছে ; সে হবে সাক্ষী। গঙ্গাধর দণ্ডবতে, গঙ্গাধর যাদব ও সূর্যদেব শর্মা পলাতক।

কিন্তু সাভারকর ? হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি, বিপ্লবী বীর, দেশপ্রেমিক সাভারকর ?

অভিযোগ কী ?

"১লা ডিসেম্বর ১৯৪৭, ও ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮এর মধ্যে পুণা, বোম্বাই, দিল্লি ও অন্যান্য জায়গায় তোমরা চক্রান্ত করেছিলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে হত্যা করতে…"

দিনের পর দিন বিচার চলেছে। আসামীরা অপরাধ স্বীকার করেনি। তাদের প্রায় সকলেরই হাবভাবে কেমন যেন গর্বের ও ব্যঙ্গের আভাস। শুধু উদাসীন সাভারকর্। হয়তো আদালতে বসে মনে পড়ে অতীতের দিনগুলোর কথা : জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে যাওয়া, দিনের পর দিন স্বাধীনতার তীব্র কামনায় বিদ্রোহী জীবন, বহু অত্যাচার ও দীর্ঘ কারাবাস। তারপব কোথায় গেল বীরত্বের অগ্নিপরীক্ষা, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান? ক্ষমা আর প্রেমের মধ্যে জলে উঠল দাঙ্গার আগুন। স্বাধীনতা এল হিন্দুর সর্বনাশের ভিতর দিয়ে, এল বিভক্ত ভারতে। যে হিন্দুধর্ম আধুনিক ভারত ছাড়িয়েও মধ্য প্রাচ্যে ও দূর প্রাচ্যে এগিয়ে এসেছিল তার হল শোচনীয় অপমান আর পরাজয় অহিংস নেতৃত্বের ফলে পঞ্চনদীর দেশে, যেখানে আর্য সভ্যতার আরম্ভ। ছত্রপতি শিবাজীর কথা মনে পড়ে; মারাঠী রক্তে আগুন ধরে যায়। কী হবে এই বিচারের কথা শুনে?

"ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে কিংবা জানুয়ারির প্রথম দু'দিনের মধ্যে এই চক্রান্ত গড়ে উঠল।" ৯ই জানুয়ারি করকরে আর মদনলাল গেল পুণায় ব্যাজের দোকানে গডসে ও আপ্তের নির্দেশে। সেখানে তারা হাতবোমা ইত্যাদি দেখল। ১৪ই জানুয়ারি গডসে ও আপ্তে বোম্বাইতে দাদার্ পল্লীতে সাভারকরের সঙ্গে পরামর্শ করল। ১৭।১৮ তারিখের মধ্যে প্রায় সকলেই এসে পৌছল দিল্লিতে।

২০শে জানুয়ারি সকাল বেলায় বিরলা-ভবনে এসে তারা পরিদর্শন

করে যায়। বিকালে হল নিজেদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ষড়যন্ত্র সেদিন সফল হল না। মদনলাল ধরা পড়ল। বোমায় কোনো ক্ষতি হল না।

২১শের মধ্যেই এরা সব দিল্লি ছেড়ে চলে গেল। ২৭শে জানুয়ারি নাথুরাম ও আপ্তে এরোপ্লেনে দিল্লি এসেই আবার গোয়ালিয়রে গেল ডাক্তার পারাচুরের কাছে পিস্তল জোগাড় করতে। ফিরে এল তারা ২৯ তারিখে।

৩০শে জানুয়ারি দল বেঁধে তারা এল প্রার্থনাসভায়।

গডসে হত্যার পরে মাঠেই ধরা পড়ল।

বোম্বাই, পুণা ও গোয়ালিয়রে বাকি আসামীদের ধরা হয় ১৪ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

বিচারের আগে মত প্রকাশ করা যায় না। এ তো শুধু অভিযোগ। কিন্তু গান্ধিজীর হত্যা যার দ্বারা, যে ভাবে এবং যে কোনো কারণেই হোক না কেন, একথা বোঝা যায় যে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে একটি বিশেষ শক্তিশালী দল ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে যাদের কাছে কংগ্রেসী নীতির কোনো মূল্যই নেই। জিন্নার মুসলিম জাতীয় রক্ষী বাহিনীর উত্তর এই দল। কিন্তু এরা চায় ভারতব্যাপী এক বিপ্লব। এদের মধ্যে যে শুধু অত্যাচারিত বা সাম্প্রদায়িক হিন্দু আছে তা নয়, এদেব মধ্যে এমন আদর্শবাদীও আছে যারা কংগ্রেসী নীতিতে আস্থা রাখে না, যাদের কাছে বর্তমান স্বাধীনতার ব্যবস্থা অর্থহীন। হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘকে দমন করলেই এই চক্রান্তের নিষ্পত্তি হতে পারে না। বহু বছরের সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদবুদ্ধির ফসল ফলতে আরম্ভ হয়েছে। গান্ধিজী একথা বুঝেছিলেন, জিন্না একথা বোঝেন নি। তাঁর

কাছে সাম্প্রদায়িকতাই ছিল পাকিস্তানের পথ। কিন্তু ইতিহাসে ক্ষমা নেই। প্রত্যেকটি কারণ ফল প্রসব করবেই। প্রতিক্রিয়া এক দিনে হয় না, কিন্তু যখন তার স্বরূপ প্রকাশিত হয় তখন আর উপায় থাকে না। নেহরু ও প্যাটেল্ তাঁদের বক্তৃতায় বার বার বিপ্লবী চক্রান্তের কথায় জোর দিয়েছেন। স্বাধীনতার দায়িত্ব আজ ভারতবর্ষে ভীষণ। গান্ধিজী নিজের প্রাণ দিয়ে হয়তো সাবধান করে দিলেন। এই আহুতিই হয়তো একদিন ভারতকে বাঁচিয়ে দেবে।

হয়তো গান্ধিজীর মৃত্যু কোনো অভাবনীয় সর্বনাশের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছে। চক্রান্তকারীরাও ভেবেছিল—অবশ্য অন্য ভাবে। ভবিষ্যৎ যেমন রহস্যময়, যা হতে পারতো অথচ হয়নি তাও তেমনি অজানা।

১০ : "হে বৎস, সম্মুখে তব..."

" - প্রসারিত ভারতের মানচিত্রখানি।"

আমরা ছেলেবেলায় যখন এই কবিতা পড়েছি তখন দেহে-মনে একটা অপূর্ব তীব্র শিহরণ অনুভব করেছি, কল্পনায় ও স্বপ্নে আগুন ধরে গেছে। এই বিরাট দেশ আমাদের, পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিগুলির মধ্যে আমাদের নাম সামনের পংক্তিতে, কতো প্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের, কতো জাতির সমন্বয়। নেহরু তাঁর "ভারত সন্ধানে" গ্রন্থে দেখিয়েছেন কী বিস্ময়কর এই মিশ্রণ ও সমন্বয়। গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগল আরো কতো জাতি এসে মিশে গেল এই বিশাল ভারতে। আর্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গল আরো কতো রক্ত মিশে গেল আমাদের দেহে। সভ্যতা ও সাধনার কী অপরূপ লীলাক্ষেত্র আমাদের দেশ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথের ধুলোয় ছোট শিশুর মুখে নেহরু দেখেছেন প্রাচীন গ্রীকের ভাস্কর্য। মধ্যপ্রাচ্যের গোলাপ, দূরপ্রাচ্যের লীলায়িত শ্যামলতা, এশিয়ার নীল নির্জন সমুদ্রের আভাস ভারতবর্ষে। ভূগোলে পড়েছি আমাদের দেশ একটি মহাদেশ, পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু আমাদের পরে যারা এসেছে ও আসবে তাদের কাছে কী মানচিত্র আমরা দেখাবো! বলব: "দেখ, এই আমাদের কৃতিত্ব।

মানচিত্রের পূর্ব ও পশ্চিম কোণে ঐ যে অন্য রঙের দু'টুকরো জায়গা রয়েছে ঐখানে ভারতের শেষ, পাকিস্তানের আরম্ভ। হিন্দু ও মুসলমান নামে দুটি জাতি আছে; ঐ দুটি জায়গা তাদেরই স্বদেশ। এক কালে এরা একই ছিল, একসঙ্গে সুখ-দুঃখে অংশ নিয়েছে, একই প্রভুর কাছে গোলামি করেছে। কিন্তু একদিন এরা হঠাৎ আবিষ্কার করল যে এরা এক নয়, এরা আলাদা, এরা আবিষ্কার করল, যে স্বাধীনতা পেতে হলে একসঙ্গে থাকা চলে না, আলাদা হয়ে যেতে হয়।"

আমাদের মধ্যে অনেকে আবার বলবেন: "এই স্টেশনের পর থেকে ঐ যে সবুজ মাঠের মাঝখানে হলুদ ধানের ক্ষেত, তারই ধারে ছিল আমাদের বাড়ি; আজ আর নেই।" কেউ বলবেন: "নদীর ওপারে ঐ যে ঘন বন যার পেছনে জমি পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে রেল লাইনের পাশ দিয়ে নেমে গেছে, ঐখানে ছিল আমাদের বাড়ি। এখন যেখানে আছি এটা আমাদের স্বদেশ নয়।"

এই আমাদের সৃষ্টি, এই আমাদের কৃতিত্ব।

১৫ই অগস্ট ১৯৪৭, রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন "এক ও অখণ্ড করে যে দেশকে ঈশ্বর ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন সে হল আজ বিভক্ত। এই বিচ্ছেদের ব্যথা আমি স্বীকার না করে পারি না।"

ঠিক এক বছর পরে ১৯৪৮এর জুলাই মাসে নেহরু বললেন: "ওরা আমাদের জীবনে এতো তিক্ততা এনেছে, পরস্পর সম্পর্ক এতো অপ্রিয় করে তুলেছে, যে যদি ওরা আবার মিলতেও চায় আমরা মিলতে পারিনা।"

পাকিস্তান সরকার জানালেন:

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, রাত্রি দশটা পঁচিশ মিনিটের সময় কায়েদে আজমের মৃত্যু হয়েছে।

এ মৃত্যু পাকিস্তানের ঘটনা। কিন্তু এর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। দু'বছর আগে বা পরে এ মৃত্যু ঘটলে ভারত বা পাকিস্তানের ইতিহাস "হত অন্য রূপ।" শুধু একথাটা ভাবলেই বোঝা যায় জিন্নার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কী অবিচ্ছেদ্য ভাবে প্রাচ্যের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে।

ভাইয়ে-ভাইয়ে যখন বনে না তখন একান্নবর্তী পরিবার অচল হয়ে পড়ে। আলাদা হয়ে তারা সুখে-দুঃখে দিন কাটায়। কিন্তু দেশ ভাগ করে আলাদা হয়ে গিয়েও তো আমরা সুখী হইনি, সন্তুষ্ট হইনি। পরস্পর সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়েছি, পরস্পর সম্পর্ক দিনে দিনে তিক্ত করে তুলছি। আগে দাঙ্গা করেছি, এখন "যুদ্ধং দেহি" ভাব! তাহলে আলাদা হলাম কোথায়? আর আলাদা হয়ে লাভ হল কী?

মানুষ বর্তমানের দুঃখ ভোলে ভবিষ্যতের আশায়। কালো রাতের কিনারে ফোটে উষার গোলাপ।

গওবা তাঁর 'পাকিস্তানের ভিতরে' বইখানিতে লিখেছেন: "যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সৃষ্টি করে কালের স্রোতে মিলিয়ে গেছে এমন ক্ষুদ্র লোকের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে ভিড় করে আছে। কিন্তু ভাগ্য ও প্রকৃতি ভারতের যে ঐক্য অভিলাষ করেছে সময়ের বিরাট মিছিলে তার ব্যাঘাত ঘটেনি। অনেক রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে···কিন্তু সময় তাদের সকলকেই বিস্মৃত করে দিয়েছে। ঘৃণায় কখনো স্থায়ী সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।"

ভারতের নিস্তব্ধ নীরব মানচিত্র যুগে যুগে সব পরিবর্তন সহ্য করেও নিজের অপরূপ অখণ্ডতা রক্ষা করে চলেছে।

এক বছর আগে স্বাধীনতার যে রথ যাত্রা শুরু করেছিল আজ তার প্রথম দিকচিহ্নকে ভারতবর্ষ পেরিয়ে চলেছে। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭। মনে হয় যেন সেদিন। তবু স্বাধীনতার বছর ঘুরে এল, আজ আর সেই প্রথম প্রহরের বিহ্বলতা নয়, আজ আত্মপরীক্ষার দিন, অতীতকে যাচাই করে ভবিষ্যতের পথকে চিনে নেবার দিন। ইতিহাসের বিরাট প্রাঙ্গনে এক বছরের যাত্রা পলকমাত্রও নয়, প্রতি পলকে একটি সমস্যার সমাধান হলেও বুঝি ভারতের সমস্যা-সমুদ্রের পার মেলে না। কিন্তু তবু নিশ্চেষ্টতার অবসর নেই, ভোরের আলোর মধ্যেই আছে দিনের নির্দেশ, তাই এই সংক্ষেপ যাত্রায়ও আছে গতির আভাস। কি সেই গতি? কোনদিকে চলেছে আজকের নতুন ভারতবর্ষ? যে বিপুল আশায় আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ একদিন আত্মহারা হয়ে উঠেছিল তার অঙ্কুর কি দিনে দিনে বিকশিত হচ্ছে হৃদয়ে হৃদয়ে? দীন যে দরিদ্র যে, সে কি নব জীবনের সঙ্কেত পেয়েছে আমাদের বৎসরব্যাপী ক্রিয়াকলাপে? এই প্রশ্ন আজ ভারতের অগণিত জনসাধারণের মনে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত।